কাদিয়ান ও
এর পবিত্র স্থানসমূহ

কাদিয়ান আওর উস্‌কে মোকাদ্দাস মোকামাত

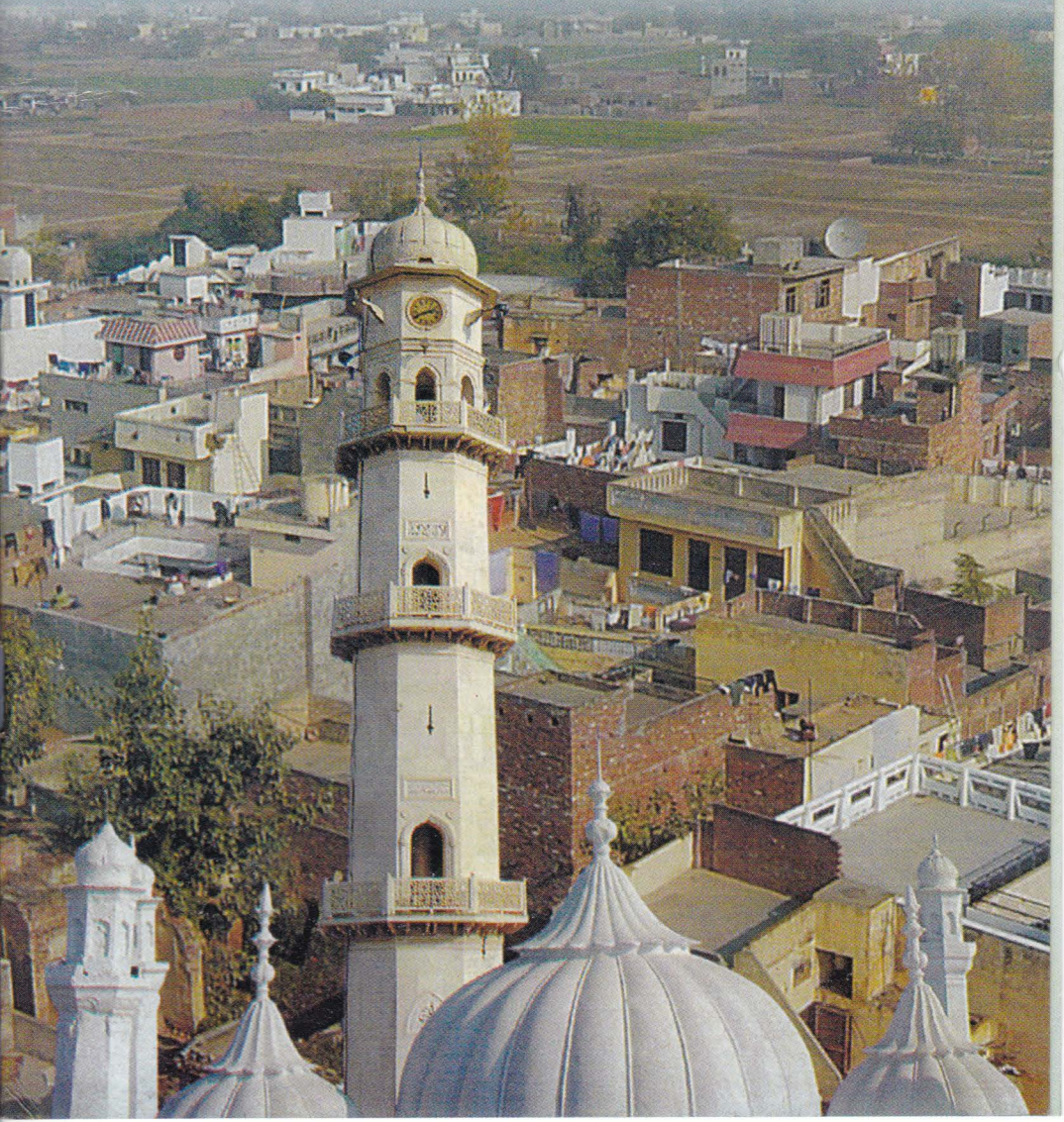

কাদিয়ানের কতিপয় পবিত্র স্থানের ছবি

কাদিয়ান ও
এর পবিত্র স্থানসমূহ

(কাদিয়ান আওর উস্‌কে মোকাদ্দাস মোকামাত)

মুহাম্মদ হামীদ কাওসার

এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ

তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী

কাদিয়ান

ভাষান্তর ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

প্রকাশনায় ঃ
মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ

ভাদ্র	১৪১৩ বঙ্গাব্দ
সাবান	১৪২৭ হিজরী
আগস্ট	২০০৬ খৃষ্টাব্দ

২০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুখবন্ধ

কাদিয়ানের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ভারতে পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কাদিয়ানেই জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি সমাহিত হন। এ কাদিয়ানের মাটি ৭৩ বছরব্যাপী পবিত্র মসীহের পদচারণার সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছে। একটি হাদীস থেকে কাদিয়ানের সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আমাদের আকা সৈয়্যদানা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কল্যাণ লাভের জন্য মাত্র এবং কেবলমাত্র মদিনার 'মসজিদে নবুবী' এবং 'খানা কাবা' ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহিস সালামের 'মসজিদে আক্‌সা'র এ দিকেই সফর করতে হবে। রসূল করীম (সাঃ) এর এ হাদীসটি আপনারা 'সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল হজ্জ বাবু ফজলেল মাসাজেদুস সালাতে' দেখতে পারেন।

মোহতারাম মুহাম্মদ হামীদ কাওসার, এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, তালীমুল কুরআন ও ওয়াক্‌ফে আরযী, কাদিয়ান তাঁর লেখা পুস্তক 'কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত' এ কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থান সমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। দোয়া ও নফল ইবাদতের দিক থেকে যে সব স্থান বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকের লেখক সে সব স্থানকে তাঁর লেখায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যাতে কাদিয়ান সফরকারীরা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন। এ পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর এ খেদমত কবুল করুন ও তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

এ অনুদিত পুস্তকটি পাঠে বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনেরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকভাবে অনেক লাভবান হবেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

খাকসার

মোবাশশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

১০ আগষ্ট, ২০০৬ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের জামেয়া আহমদীয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল মুরুব্বি সিলসিলা মোহতারাম মাওলানা সালেহ্ আহমদ তাঁর ১৩ জন মোবাশ্বের মুরুব্বি ছাত্রসহ ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক শিক্ষা সফরে কাদিয়ান গমন করেন। মাওলানা সাহেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে খাকসারও তাদের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করি। তাদের সাথে আমিও প্রায় এক মাস কাদিয়ানে অবস্থান করি। যদিও আল্লাহ্তাআলার ফযলে এর পূর্বেও বেশ কয়েকবার আমার কাদিয়ান যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু এ যাত্রায় প্রথমবার আমি হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায় যাওয়ার এবং হুশিয়ার-পুরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে কক্ষে চিল্লাকশী করেছিলেন এবং লুধিয়ানায় যে কক্ষে তিনি প্রথম বয়াত নিয়েছিলেন এ কক্ষ দু'টিতে দোয়া করার তওফীক লাভ করি। কাদিয়ান থাকাকালীন সময়ে মোহ্তারাম মাওলানা মুহাম্মদ হামীদ কাওসার কর্তৃক উর্দূতে লেখা 'কাদিয়ানা আওর ঔসকে মোকাদ্দাস মোকামাত' (কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানমূহ) পুস্তকটি আমার হাতে আসে। সেখানে বসেই আমি বইটি পড়ে শেষ করি এবং যারপর নাই অভিভূত হই। কেননা ইতোপূর্বে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল অনেকটা ভাসাভাসা। কিন্তু এ বইটি পড়ে কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহের সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করি। তখনই আমার মাঝে বইটি বাংলায় অনুবাদ করার প্রচন্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বইটি অনুবাদে মুরুব্বি সিলসিলা মোহতারাম মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক আমাকে সাহায্য করেছেন। মুরুব্বি সিলসিলা মোহতারাম মাওলানা সালেহ্ আহমদ অনুবাদটি উর্দূ বইটির সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন এবং তিনি সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। মোহতারাম মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নুরুল আমীন কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহের সব ক'টি ছবি সংগ্রহ করেন এবং এগুলো অনুদিত বইটির যথাস্থানে সংযোজিত করেন। অনুদিত বইটি মুদ্রনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা মোহতারাম নাসির উদ্দিন মিল্লাত। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোবাশশেরউর রহমান বইটি প্রকাশনার সদয় অনুমোদন প্রদান করেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলা এদের সবাইকে সর্বোত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার দরবারে এ বিনীত দোয়া করি, এ অনুদিত পুস্তকের পাঠকগণ যেন কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করেন এবং বারবার কাদিয়ান যাওয়ার ও এর বিভিন্ন পবিত্র স্থানে নফল ইবাদত ও দোয়ায়রত হওয়ার তৌফীক লাভ করেন। তবেই খাকসারের শ্রম সার্থক হবে।

ঢাকা
১০ আগষ্ট, ২০০৬ ইং

নাজির আহমদ ভূঁইয়া
খাকসার

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)
(১৮৩৫-১৯০৮)

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে ও কৃপায় কয়েক বছর থেকে কাদিয়ান সালানা জলসায় যোগদানের জন্য 'নও মোবাইন' (নুতন আহমদী), পুরাতন আহমদী, তাদের সন্তানেরা এবং যুবকেরা বিপুল সংখ্যায় আগমন করছেন। এছাড়াও অ-আহমদী ভ্রাতাগণ ও জেরে-তবলীগ বন্ধুগণও জলসায় যোগদান করছেন। এরা সকলেই কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থান সমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে আসছেন। কোন কোন সময় আমাদের অনবহিত ভাইগণ এরূপ উত্তর দিয়ে থাকেন, যা সঠিক নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি পুস্তিকা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে মৌলিক এবং তবলীগের বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য থাকে।

মুহাম্মদ হামীদ কাওসার, এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী, যিনি সালানা জলসার সময় নাযেম তরবিয়তের দায়িত্বও পালন করে থাকেন, তিনি উপরোক্ত প্রয়োজন মিটানোর জন্য একটি পুস্তিকা তৈরী করেন। এ পুস্তিকাটি জলসা সালানার তরবিয়ত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হচ্ছে।

আশা করি জামাতের বন্ধুগণ নিজেরাও এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং এর আলোকে নও মোবাইন এবং অ-আহমদী বন্ধুগণকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

খাকসার

ডাঃ মুহাম্মদ আরেফ
অফিসার জলসা সালানা
কাদিয়ান, ২০০৪ইং

সূচীপত্র

১। কাদিয়ানের ইতিহাস ও এর অবস্থান ১১
২। মোস্তফা (সাঃ)-এর হাদীসের আলোকে কাদিয়ানের গুরুত্ব ১২
৩। পূর্ববর্তী ধর্মীয় কেতাব সমূহে কাদিয়ানের উল্লেখ ১৫
৪। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার আলোকে কাদিয়ানের গুরুত্ব ১৬
৫। পবিত্র স্থানসমূহ ১৭
৬। মসজিদে মোবারক ১৮
৭। মসজিদে মোবারকের নির্মাণ ১৯
৮। আদি মসজিদের অভ্যন্তরীণ চিত্র ১৯
৯। মসজিদে মোবারকের সম্প্রসারণ ২১
১০। মসজিদের উপরের ছাদ ২১
১১। মসজিদে মোবারক সম্পর্কে ইলহামসমূহ ও ঘটনাবলী ২৪
১২। লাল কালির নিদর্শনওয়ালা কক্ষ ২৮
১৩। বাইতুল ফিক্‌র ৩২
১৪। হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এ দালান ৩৩
১৫। বাইতুদ্‌দোয়া ৩৩
১৬। বায়তুর রিয়াযত (সাধনার গৃহ) ৩৬
১৭। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন ৩৮
১৮। মসজিদে আক্‌সা ৩৯
১৯। মসজিদে আকসার বৈশিষ্ট্যাবলী ৪১
২০। মীনারাতুল মসীহ্ ৪২
২১। বেহেশ্‌তী মাকবেরা ৪৩
২২। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় বিদ্যমান পবিত্র স্থানসমূহ ৪৬
২৩। হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর ঘর ৪৮
২৪। বসার জায়গা ৪৯
২৫। জানাযা গাহ্ ৪৯
২৬। কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল ৫০
২৭। আরো কিছু স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক স্থান-গোল কামরা ৫১
২৮। প্রাচীর ৫২
২৯। হযর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারের পূর্বপুরুষগণের কবরস্থান ৪৪
৩০। মসজিদে নূর ৫৬
৩১। হুসিয়ারপুর ৫৮
৩২। পবিত্র কক্ষে সম্মিলিত দোয়া ৬০
৩৩। দারুল বয়াত লুধিয়ানা ৬২

কাদিয়ানের ইতিহাস ও এর অবস্থান

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সৈয়্যদানা মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস সালামের পূর্ব পুরুষগণের মাঝে এক ব্যক্তি ছিলেন হযরত মির্যা হাদী বেগ সাহেব। তিনি পারস্য বংশীয় (অর্থাৎ ইরানী খানদান) ছিলেন। তিনি সমরকন্দ এলাকা থেকে হিজরত করে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ২০০ সঙ্গী-সাথী নিয়ে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, যেখানে এখন কাদিয়ানের বসতি। সেই সময় এ এলাকা ছিল জনমানবহীন জঙ্গল। দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন জন বসতি ছিল না। নিজের আবাদকৃত এ গ্রামের নাম তিনি "ইসলামপুর" রাখেন। পরিবর্তন ও বিবর্তনের বিভিন্ন পর্য্যায় অতিক্রম করে ইহা "ইসলামপুর কাজী" এবং অতঃপর "কাদিয়ান"-এ রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ এলাকা মহিষের জন্য খুবই খ্যাত ছিল বলে একে "মাজ্হা" (মহিষের চারণ ভূমি) বলা হতো। কাদিয়ান লাহোর থেকে ৭০ মাইল এবং অমৃতসর থেকে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অনুরূপভাবে বাটালা থেকে এর দূরত্ব ১১ মাইল এবং গুরুদাসপুর থেকে ১৮ মাইল।

এ কাদিয়ানেই আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস সালাম ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬শে মে,১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোরে মৃত্যুবরন করেন। সেখান থেকে তাঁর (আঃ) পবিত্র মরদেহ কাদিয়ানে আনা হলো এবং ২৭শে মে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে কাদিয়ানের বেহেশ্তী মাকবেরায় সমাহিত করা হয়।

সৈয়্যদানা ইমাম মাহদী আলাইহেস সালামের জন্মস্থান ও সমাধিস্থল হওয়ার দরুন কাদিয়ান সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে এবং আহমদীয়া জামাতের প্রারম্ভিক ও স্থায়ী কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পূর্বে কাদিয়ানের আশে পাশে বাটালা, অমৃতসর, গুরুদাসপুর ও পাঠানকোটে বসবাসকারী

আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা কাদিয়ানকে ধ্বংস করে দেয়ার হুমকী দিত। তারা মীনারাতুল মসীহ্ ভেঙ্গে ফেলার এবং বেহেশ্তী মাকবেরার কবরগুলো উপড়ে ফেলার জন্য কসম খেতো। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার অমোঘ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধবাদীদের বুযুর্গগণের কবর ও মসজিদসমূহের নাম ও নিশান নিশ্চিহ্ন করে দিল। কোথায় গেল মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর কবর ও মসজিদ এবং সানাউল্লাহ অমৃতসরীর মসজিদ ও বাসগৃহ! এ সকল শহরে এদের কোন নামও অবশিষ্ট রইলো না। কিন্তু এর বিপরীতে যাঁকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তাঁর কবরে প্রতিদিন দোয়াকারীগণের ভীড় লেগে থাকে। মীনারাতুল মসীহ্ থেকে দৈনিক পাঁচবার উচ্চস্বরে আযান দেয়া হয়। এ আযান কখনো বন্ধ হয়নি এবং না কখনো হবে, ইন্শাল্লাহ্তাআলা। এটা যদি হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস সালামের সত্যতার অগণিত প্রমাণের এক মহা প্রমাণ না হয়ে থাকে, তবে এটা কী ?

মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে কাদিয়ানের গুরুত্ব

আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানগণকে বলেছিলেন:

"লা তুশাদ্দুর রেহালু ইল্লা ইলা সালাসাতে মাসাজেদা মাসজেদী হাজা ওয়া মাসজেদেল হারামে ওয়া মাসজেদেল আক্সা" (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল হজ্জ বাবু ফজলেল মাসাজেদুস সালাদে)।

আবূ হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি মসজিদের দিকে-আমার এ মসজিদ (মসজিদে নবুবী মদিনা মনোয়ারা) এবং মসজিদে হারাম (খানা কাবা) এবং মসজিদে আক্সার দিকে ব্যতীত উটের পিঠে গদি বাঁধা যাবে না।

কুরআন মজীদে এই মসজিদে আক্সার বর্ণনা রয়েছে: "সুবহানাল্লাজী আরা বেআবদেহী লাইলাম মিনাল মাসজেদেল হারামে ইলাল মাসজেদেল আক্সাল্লাজী বারাকনা হাওলাহু" (সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত-২)।

তিনি পরম পবিত্র, যিনি রাতের বেলায় নিজ বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সার দিকে নিয়ে গেলেন, যার চারপাশ আমরা বরকতমন্ডিত করেছি।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম বলেন : "এ স্থলে মসজিদে আক্সার অর্থ জেরুজালেমের মসজিদ নয়, বরং প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহেস সালামের মসজিদ, যা পরবর্তী যুগে খোদার দৃষ্টিতে মসজিদে আক্সা।" (খুতবা ইলহামীয়া, পৃষ্ঠা-১৯, রুহানী খাযায়েন খন্ড-১৬ পৃষ্ঠা ১৯)

"স্থানের ভ্রমণের দিক থেকে খোদাতায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিলেন।"(খুতবা ইলহামীয়া পৃষ্ঠা-২১)

"যুগের ভ্রমণের দিক থেকে আঁ-হযরতকে (সঃ) ইসলামের প্রতাপের যুগ থেকে, যা আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ ছিল, ইসলামের কল্যাণ ও আশীষের যুগ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিলেন, যা প্রতিশ্রুত মসীহের যুগ।" (খুতবা ইলহামীয়া, পৃষ্ঠা-২১)

উপরোক্ত হাদিস এবং অন্যান্য আরো কোন কোন হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সৈয়্যদানা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহেস সালামের আবির্ভাবের পর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কল্যাণ লাভের জন্য মাত্র এবং কেবল মাত্র মদীনার "মসজিদে নবুবী" এবং "খানা কাবা" ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহেস সালামের "মসজিদে আকসার" দিকেই সফর করতে হবে। অন্য দিকে আল্লাহ্তাআলা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামকে ১৪ বার ইলহাম করেন :- "এত অধিক সংখ্যায় লোকেরা তোমার দিকে আসবে যে তারা যে সকল পথে চলবে তা গর্ত হয়ে যাবে।" সৈয়্যদানা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সালানা জলসার সূচনালগ্নে বলেন :

"এই জলসাকে মানুষের সাধারণ জলসার ন্যায় মনে করো না। এটা সেই বিষয়, যার ভিত্তি হলো একনিষ্ঠ সাহায্য, ও সত্য ধর্মের প্রচার। এ সেলসেলার ভিত্তি প্রস্তর খোদাতাআলা নিজ হাতে রেখেছেন এবং এর জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা অচিরেই এতে মিলিত হবে।" (মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের লেখায় জাতি সমূহের মিলিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসে "লা তাশাদ্দুররেহাল" (অর্থাৎ উটের পিঠে গদি বাঁধা-অনুবাদক) মিলিত হওয়ার জন্য আরোহীদের প্রস্তুত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রভু ও ভৃত্যের কথা বড়ই গৌরবের সাথে পূর্ণ হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে, ইনশাল্লাহ্তাআলা।

"জমীন কাদিয়ান আব মহ্তরম হ্যায়
হুযুম খাল্ক সে আরদ্ হারাম হ্যায়"

(অর্থাৎ কাদিয়ানের ভূমি এখন সম্মানিত। মানুষের ভীড়ে মাটি পবিত্র-অনুবাদক)।

হযরত আলী রাযী আল্লাহ আলাইহে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম বলেন, এক ব্যক্তি আর্বিভূত হবেন নদীর এদিকে বা ঐদিকে। (মিশকাত, বাবে আসরাতুস সায়াত)

ঠিক এ হাদিস অনুযায়ী সৈয়্যদানা হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন, যা বিপাশা নদী থেকে কয়েক মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

এভাবে হযরত শেখ আলী হামযা বিন আলী মালেক আত্তুসী (রা:) তাঁর কেতাব 'জোয়াহেরুল আসরার' এ হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস সালামের আর্বিভাব স্থল সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি লেখেন : - "আরবাইনে লেখা আছে মাহ্দী আলাইহেস সালামের আবির্ভাব হবে 'কাদ্' আ' গ্রাম থেকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, মাহদী এক গ্রামে আর্বিভূত হবেন, যাকে 'কাদ' আ' বলা হবে। 'কাদ ' আ' দ্বারা কাদিয়ানকে বুঝায়।

পূর্ববর্তী ধর্মীয় কেতাব সমূহে কাদিয়ানের উল্লেখ

পবিত্র ইঞ্জিলে নিম্নলিখিত ভাষায় "এক নুতন জেরুজালেম" এর উল্লেখ করা হয়েছে :-

"সেই নুতন জেরুজালেমের নাম আমার খোদার কাছ থেকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে এবং তাতে আমার নুতন নাম লিখবো।" (মোকাশেফা ইউহানা ৩-১২)।

আর এই "জেরুজালেম" সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে লিখিত আছে, "হে জেরুজালেম, আমি তোমার প্রাচীর সমূহে প্রহরী নিযুক্ত করেছি।" (ইয়াসাআ, ৬-৬২)

"সেদিন জেরুজালেম থেকে 'আবে হায়াত' (অর্থাৎ জীবনের পানি- অনুবাদক) জারী হবে, যার অর্ধেক নহর পূর্ব দিকে সমূদ্র প্রবাহিত হবে এবং অর্ধেক পশ্চিম দিকে। গ্রীষ্ম ও শীতে জারী থাকবে এবং খোদাওন্দ সারা বিশ্বের বাদশাহ্ হবেন। সেদিন একই খোদাওন্দ হবেন এবং তাঁর নাম হবে 'ওয়াহেদ' (এক ও অদ্বিতীয়)।" (জাকরিয়া- ১০-১৪)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ্ মাউদ আলাইহেস সালাম বলেন :-

"প্রকৃতপক্ষে জেরুজালেমের অর্থ 'দারুল আমান' (শান্তির ও নিরাপত্তার গৃহ)। জেরুজালেমের অর্থ হলো, সে শান্তি ও নিরাপত্তা দেখছে। এটাই আল্লাহ্র বিধান, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীতে আসল শব্দ ব্যবহার করেন এবং এর অর্থ হয়ে থাকে এর বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য্য। এভাবেই বায়তুল মোকাদ্দাস অর্থাৎ মসজিদে আক্সা। এ মসজিদের নামও আল্লহ্তাআলা মসজিদে আক্সা রেখেছেন। কেননা আক্সা (অর্থাৎ দূরবর্তীস্থান) যুগের দিক থেকে অথবা স্থানের দিক থেকে হয়ে থাকে। আর "মসজিদে আক্সার দিকে নিয়ে গেলেন, যার চারপাশ আমরা বরকতমন্ডিত করেছি"- এ ইলহামে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগের কল্যাণ ও প্রভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(মলফুযাত, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫১)।

প্রমাণিত হলো, সেই "নুতন জেরুজালেম" হচ্ছে কাদিয়ান। প্রাচীরসমূহে প্রহরী নিযুক্ত করার ভবিষ্যদ্বাণীটি শব্দ "দারুল আমান" এবং ইলহাম "ইন্নি উহাফেযু কুল্লা মান ফিদ্দারে" (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৪২৮) এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এ নুতন জেরুজালেম থেকেই হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস সালামের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক "আবে হায়াত" জারী হয়েছে, যা সারা বিশ্বকে প্লাবিত করছে এবং সদা-সর্বদা করতে থাকবে।

বেদে কাদিয়ানের নাম 'কাদউন' লেখা আছে। (সূত্র সোক্ত ৯৭, মন্ত্র -৩) হযরত বাবা নানক সাহেব বলেন ঃ-

"এক জাট (জমিদার) হবে। কিন্তু আমার একশত বছর পরে হবে এবং বাটালার পাশে হবে।" *(জনম শাখী ভাই বালাওয়ালী বাড্ডী শাখী, পৃষ্ঠা-২৫১, মুফীদ আর্ম প্রেস, লাহোর থেকে মুদ্রিত)*।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের লেখার আলোকে কাদিয়ানের গুরুত্ব

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম কাদিয়ান সম্পর্কে বলেন ঃ

"খোদা এই বিরানভূমিকে অর্থাৎ কাদিয়ানকে লোকদের সমবেত হওয়ার গৃহ বানিয়েছেন। প্রত্যেক দেশের লোক এখানে এসে একত্র হচ্ছে" (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খন্ড, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৯৫)

"একদিন আসবে যখন কাদিয়ান সূর্য্যের ন্যায় চমক দিয়ে দেখিয়ে দেবে এটা সত্যবাদীদের স্থান।" (দাফেল বালা, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৩১)

"আমাকে দেখানো হয়েছে, এ এলাকা এতখানি আবাদ হবে যে বিপাশা নদী পর্যন্ত বসতি স্থাপিত হবে।" (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-৭৮২)

"আমি কাশ্‌ফে দেখেছি, কাদিয়ান অনেক বড় এক শহর হয়ে গেছে এবং দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বাজার বিস্তৃত হয়ে গেছে। দোতলা, চারতলা বা এর চেয়েও বেশি উঁচু ছাঁদ-বিশিষ্ট অট্টালিকায় দোকান পাট বসে গেছে। আরো দেখেছি, বাজারের সৌন্দয্যবর্ধনকারী বড় বড় ভূড়িওয়ালা মোটা মোটা শেঠেরা বসে আছে। তাদের মনি-মুক্তা, রত্নাদি, হীরা-জহরত, টাকা-পয়সা ও আশরাফীর স্তুপ লেগে যাচ্ছে। আর হরেক রকম দোকান পাট সুন্দর সুন্দর পণ্যে শোভা পাচ্ছে। এক্কা গাড়ী, টম টম, টিন, পাল্কি, ঘোড়া, বিভিন্ন যানবাহন এবং পায়ে চলার লোক এত বিপুল সংখ্যায় বাজারে আসা-যাওয়া করছে যে এদের সকলের কাঁধের সাথে কাঁধ লেগে যাচ্ছে এবং রাস্তায় পথ পাওয়াই মুস্কিল হয়ে পড়ছে।" (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-৪১৯)

পবিত্র স্থানসমূহ

সাহাবী হযরত মিঞা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সানুয়ারী সাহেব (রাঃ) কাদিয়ানে আসার পর তাঁর নিজের অবস্থা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন:

"আমি কাদিয়ানে আসি। এখানে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আমার কাছে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ উদঘাটিত হতে থাকে এবং আমি এরূপ অনুভব করি যেন আমার হৃদয়ে অর্থের একটি বাঁধা থলে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, আমাকে কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞান দিয়েই পাঠানো হয়েছে। এর সেবাকেই আমার কর্তব্য বলে স্থির করা হয়েছে। এটাই হলো আমার সাহচর্য্যের কল্যাণ।" (সীরাতুল মাহ্দী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০১)

হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহীদ (রাঃ) বলেনঃ

"কাদিয়ান শরীফে সে-ই আরামে থাকে, যে অনেক দরুদ শরীফ পড়ে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের আহ্লে-বয়াতকে ভালবাসে। মসজিদ মুবারকে আল্লাহ্তাআলা মক্কা-মদীনার সকল কল্যাণ অবতীর্ণ করেছেন।" (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, জুলাই, ২০০৩)

সম্মানিত পাঠকগণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলো পড়ার পর এ ধারণা পেয়ে গেছেন, কাদিয়ানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশও পবিত্র এবং সম্মানযোগ্য।

কাদিয়ানের মাধ্যমে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে তা ছাড়াও এ মাটি কমবেশি ৭৩ বছর ব্যাপী পবিত্র মসীহের পদচারণার সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছে। আর তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এর পরিবেশ ও বাতাসকেও পবিত্র করেছে। যা হোক কাদিয়ানের সকল পবিত্র এবং ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় স্থানসমূহের বর্ণনা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় দেওয়া সম্ভব নয়। স্থান সংকুলান সাপেক্ষে নিম্নে কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হলো। **বিশেষভাবে দোয়া ও নফল ইবাদতের দিক থেকে যে সকল স্থান গুরুত্বপূর্ণ সেই সকল স্থানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এগুলোর মাঝে মসজিদে মোবারক তালিকার শীর্ষে রয়েছে।**

মসজিদে মোবারক

কাদিয়ানে মসজিদে আক্সা বিদ্যমান থাকায় বাহ্যত অন্য কোন মসজিদের প্রয়োজন ছিল না। কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম এবং কতিপয় লোক ছাড়া এতে কোন নামাযীই ছিল না। যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আহমদীয়া আন্দোলনের সূত্রপাত তাঁর

মসজিদে মোবারক

উপর ন্যস্ত হবার ছিল এবং তাঁর (আঃ) হাতে ইসলামের সমর্থনে বিশ্বজনীন কলমের যুদ্ধের সূত্রপাতের যুগ নিকটে এসে গিয়েছিল, তাই হুযূর (আঃ) জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক কর্ম তৎপরতার যে বিশাল ক্ষেত্রের সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন এর জন্য এরূপ একটি 'বাইতুযযিকির' (উপাসনালয়)এর প্রয়োজন ছিল, যা তাঁর (আঃ) বাসস্থান সংলগ্ন হওয়ার কথা ছিল। হযরত আকদাসকে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে বহু সুসংবাদসহ একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। এই মসজিদ, যাকে মসজিদে মোবারক বলা হয়, পূর্ণ মহিমা ও গৌরবের সাথে আজো কাদিয়ানে বিদ্যমান রয়েছে যার খ্যাতি বিশ্বজনীন।

মসজিদে মোবারকের নির্মাণ

মসজিদে মোবারকের ভিত্তি (হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেবের চাক্ষুষ সাক্ষ্য অনুযায়ী) ১৮৮২ সালে এবং হযরত শেখ ইয়াকুব আলী তুরা সাহেবের (রাঃ) গবেষণা অনুযায়ী ১৮৮৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। হযরত আকদাসের গৃহের সাথে যেখানে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে কোন উপযুক্ত স্থান ছিলনা। কেননা "বায়তুল ফিকির" এর পিছনে গলি ছিল এবং গলির সাথে তাঁর (আঃ) চাচা মির্যা গোলাম মহিউদ্দিনের জায়গা ছিল। আর এ জায়গায় তার আদি দালানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল আটা পিষার চাক্কী। এর অবশিষ্ট জায়গায় উত্তর দিকে একটি পুরাতন ভাঙ্গা চোরা প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল। হুযূর এই প্রাচীরে এবং নিজ গৃহের দক্ষিনের প্রাচীরে নিজের বাগানের দেশী কাঠ দিয়ে ছাদ তৈরী করিয়ে নিলেন। ইট যোগাড় করার জন্য কোন কোন পুরাতন দালান খোদাই করা হলো। মসজিদের অভ্যন্তরের কাজ ১৮৮৩ সালের ১৯শে অক্টোবরে সমাপ্ত হলো। কিন্তু এর চুনকাম পরবর্তীতে করা হয়েছিল।

আদি মসজিদের অভ্যন্তরীণ চিত্র

মসজিদে মোবারকের অভ্যন্তর ভাগে তিনটি অংশ ছিল। প্রথমে পশ্চিমের অংশ, যেখানে ইমামের মেহরাবী কোঠা ছিল। এর পশ্চিম এবং উত্তরে দু'টি জানালা এবং পূর্বের প্রাচীরে একটি দরজা ছিল, যা

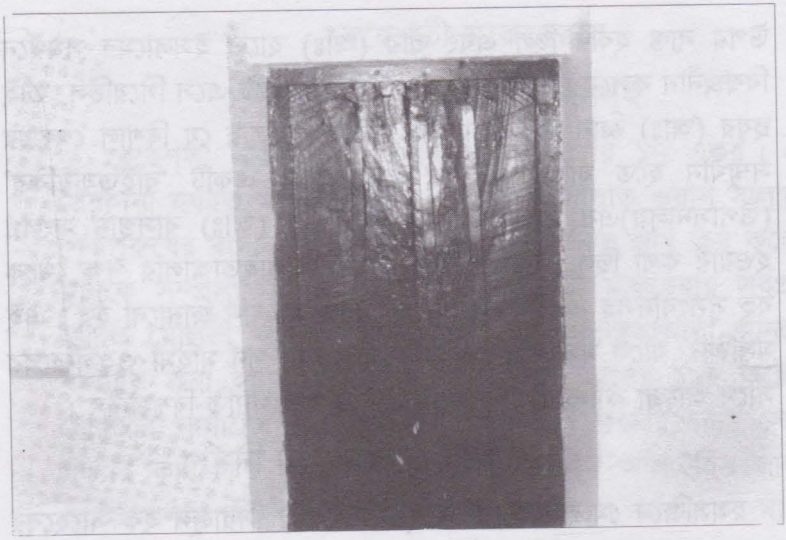

এটা ঐ দরজা যা দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মসজিদে মোবারকে আসতেন

কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দু'এক ব্যক্তির বিশ্রামের জন্য খুব ছোট এবং স্থায়ী কক্ষে পরিণত হতো। মধ্যবর্ত্তী অংশে দুই কাতারে ছয় জন করে নামাযীর জায়গা হতো। এই অংশে "বায়তুল ফিকির" এর জানালা খোলা হতো। বিপরীত দিকে দক্ষিনের প্রাচীরের আলোর জন্য একটি জানালা ছিল এবং বাইরের পূর্ব অংশের সাথে সংযুক্তির জন্য একটি দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদের পূর্ব অংশ মধ্যবর্তী অংশের তুলনায় বড় ছিল। অর্থাৎ এতে কোন কোন সময় তিন সারিতে কম বেশি পনের ব্যক্তি নামায পড়তে পারতো। এ অংশ থেকে বাইরে একদিকে সিঁড়ি ছিল এবং অন্য দিকে নামাযীদের ওযূ ইত্যাদির জন্য জায়গা ছিল এবং গোসলের জায়গাও বানানো হয়েছিল। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম গরমের সময় বিশ্রামও করতেন। আর এতে 'লাল কালির ছিটার' নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব অংশে তিনটি দরজা ছিল। প্রথম দরজাটি ছিল উত্তরের প্রাচীরে, যা হযরত আকদাসের গৃহ সংলগ্ন ছিল। দ্বিতীয় দরজাটি ছিল সিঁড়ি থেকে মসজিদে প্রবেশের জন্য এবং তৃতীয় দরজাটি ছিল গোসলের জায়গার। মসজিদের উভয় দরজায় আয়াত "ইন্নাদ্দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম,"

দরুদ শরীফ এবং মসজিদ সম্পর্কে ইলহামসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। মসজিদে মোবারক নির্মাণের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম মসজিদে আক্সার পরিবর্তে মসজিদে মোবারকে নামায আদায় করতেন। শুরুর দিকে প্রায় সময় তিনি নিজেই আযান দিতেন এবং নিজেই ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন।

মসজিদ মোবারকের সম্প্রসারণ

মসজিদে মোবারকের এই আদি দালান চব্বিশ (২৪) বছর পর্যন্ত এর পূর্বের অবস্থায় এভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সময় কেবল একটি সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। আর তা হলো, লাল কালির নিদর্শনওয়ালা কক্ষকে মসজিদের ওপরের স্তরের সমান করে দেওয়া হলো। পূর্বে এ কক্ষটি দুই এক ফুট নীচে অবস্থিত ছিল। এরপর ১৯০৭ সালে হযরত মীর নাসের নবাব সাহেবের তত্ত্বাবধানে এ মসজিদকে প্রথমবার দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত করা হলো। এর ফলে এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মিনার কায়েম থাকতে পারলো না। মসজিদে মোবারকের দ্বিতীয় বার সম্প্রসারণের কাজ দ্বিতীয় খলীফার যুগে ১৯৪৪ সনের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয়। এর ফলে এই মসজিদ ১৯০৭ সালের দালানের তুলনায় স্থান সংকুলানের দিক থেকে দ্বিগুন বড় হয়ে গেল। এবার নির্মাণ তদারকীর কাজ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রাঃ) সম্পন্ন করেন। (তারীখে আহমদীয়ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭)

মসজিদের উপরের ছাদ

মসজিদে মোবারকের আদি অংশের চার কোণে চারটি ছোট ছোট মিনার ছিল এবং সেখানে পৌঁছার জন্য লাল কালির নিদর্শনওয়ালা কক্ষের ছাদে দু'টি কাঠের সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছিল। জামাত কায়েম হওয়ার পর যখন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ), হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) এবং সিলসিলার অন্যান্য বুজুর্গগণ কাদিয়ানে হিজরত করে এসে গেলেন তখন এর পশ্চিম অংশে বসার স্থান বানিয়ে দেয়া হলো। এ স্থানে হযরত আকদাস আলাইহেস

সালাম মাগরিবের নামাযের পর তাঁর খাদেমগণের সাথে বসে শোভা বর্ধন করতেন এবং সাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মনি-মুক্তা বিতরণ করতেন। এ পবিত্র ও আত্মার উন্নতি সাধনকারী মাহফিলকে "সান্ধ্য আসর" এর প্রিয় নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। (তারীখে আহমদীয়ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫)

এ বরকত মণ্ডিত ছাদ সম্পর্কে ঈমান বর্ধক কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১। প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম মাহ্দী আলাইহেস সালামের সত্যতার জন্য রমযান মাসে চন্দ্রে ও সূর্য্যে গ্রহন লাগাকে এবং নিদর্শনরূপে এর প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঠিক এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমযান মোতাবেক ১৮৯৪ সালের ২১শে মার্চে চন্দ্রে গ্রহণ লাগলো এবং ১৩১১ হিজরীর ২৮শে রমযান মোতাবেক ১৮৯৪ সালের ১৬ই এপ্রিলে সূর্য্যে গ্রহণ লাগলো। মসজিদে মোবারকের এ বরাত ও সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল, যে ইমাম মাহ্দীর জন্য এ মহা নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল তিনি এ বরকতমন্ডিত ছাদ থেকে সূর্য্য গ্রহন প্রত্যক্ষ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে রাহেমাহুল্লাহ্তাআলা এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের এত পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে অবশ্যই এবং অবশ্যই আজ সূর্য্যে গ্রহন লাগবে, এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। তিনি মসজিদে মোবারকের ছাদে পরিপূর্ণ আয়োজন করেছিলেন এবং কৌতুহলের সাথে আগমনকারী দর্শকগণ, কাছাকাছি অবস্থানকারী খাদেমগণ, প্রেমিক সাহাবাগণ সকলেই মসজিদের ছাদে একত্রিত হয়েছিলেন। তিনি মসজিদে মোবারকের ছাদে এ দিনের জন্য পুরোদমে ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে নামাযে কসুফ খসুফও আদায় করা যায় এবং সূর্য্য গ্রহনের দৃশ্যও দেখা যায়। এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধুগণের সাথে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় এক বন্ধু দৌড়াতে দৌড়াতে এসে

সূর্য্য গ্রহনের সুসংবাদ দিয়ে দিলেন। হে যুগ মসীহ্ ! সূর্য্যে গ্রহন লেগেছে। হে যুগের মসীহ্! তোমার জন্য এক পরিপূর্ণ নিদর্শন পূর্ণ হয়ে গেল।" (১৯৯৪ সালের ৩১শে আগষ্ট লন্ডন সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে রাহেমাহুল্লাহুতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ)।

২। "ডাক্তার সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার শাহ্ সাহেব (রাঃ) আমার কাছে লিখিতভাবে বর্ণনা করেন, একবার ডাক্তার আব্দুল্লাহ্ সাহেব আমাকে বলেন একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর কখনো কি ফেরেশতা দেখেছেন? সেই সময় হুযূর (আঃ) মাগরেবের নামাযের পর মসজিদে মোবারকের ছাদে বসার স্থানের বাদিকে মিনারে বসে ছিলেন। তিনি (আঃ) বলেন, এ মিনারের সামনে দু'জন ফেরেশতা আমার সম্মূখে এলেন। তাঁদের কাছে দু'টি মিষ্টি রুটি ছিল। সেই রুটি তারা আমাকে দিলেন এবং বললেন, একটি তোমার জন্য এবং অন্যটি তোমার মুরীদদের জন্য।" (সীরাতুল মাহ্দী, দ্বিতীয় খন্ড, বর্ননা ৮৮৫)

৩। হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে দিন রাত্রে এশার নামাযের কাছাকাছি সময় হোসাইন নামে রোমের রাষ্ট্রদূত কাদিয়ান এলেন সেদিন মাগরেবের নামাযের পর হযরত সাহেব মসজিদে মোবারকের বসার স্থানে বন্ধুগণকে নিয়ে বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর (আঃ) মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে গেল। তিনি বসার স্থান থেকে নিচে নেমে মেম্বারে শুয়ে পড়লেন। কোন কোন লোক তাঁর পা টিপতে শুরু করলেন। কিন্তু হুযূর (আঃ) একটু পরেই সবাইকে সরিয়ে দিলেন। অধিকাংশ লোক যখন সেখান থেকে চলে গেলেন তখন তিনি (আঃ) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) মরহুমকে বলেন, একটু কুরআন শরীফ পড়ে শুনান। মৌলবী সাহেব (রাঃ) মরহুম অনেকক্ষণ ধরে সুললিত কন্ঠে কুরআন শরীফ শোনাতে থাকলেন এবং তিনি (আঃ) সুস্থ হয়ে গেলেন।" (সীরাতুল মাহদী, দ্বিতীয় খন্ড, বর্ণনা ৪৫৯)

মসজিদে মোবারক সম্পর্কে ইলহামসমূহ ও ঘটনাবলী

মসজিদে মোবারকের অন্য নাম 'বাইতুয যিকর'ও বটে। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

১। **'আলাম নাজআল্লাকা সুহুলাতান ফী কুল্লি আমরি বাইতুল ফিকরি ওয়া বাইতুয যিক্রি ওয়া মান দাখালাহু কামা আমিনান।'**

অনুবাদ ঃ আমরা কি সব বিষয়কে তোমার জন্য সহজ করে দেইনি? তোমাকে বাইতুল ফিক্র ও বাইতুয যিক্র দান করা হয়েছে। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ১০৫)

২। 'যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইবাদতের জন্য সুস্থ নিয়তে ও স্বচ্ছ ঈমান নিয়ে বাইতুয যিক্রে প্রবেশ করবে সে মন্দ পরিণাম থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।'

৩। **'মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারাকিন ইয়ুজআলু ফীহি'**। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-১০৬)

অনুবাদ ঃ এ মসজিদ বরকতদানকারী ও বরকতপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেক বরকতমন্ডিত কাজ এখানে করা হবে।

৪। হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন ঃ

এ মসজিদ সম্পর্কে পাঁচ বার ইলহাম হয়েছে, **'ফীহি বারাকাতুন লিন্নাসি ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনান'**।

অনুবাদ ঃ এতে লোকদের জন্য রয়েছে বরকতসমূহ। আর যে-ই এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।

৫। আজ রাতে কী আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখলাম। কয়েকজন ব্যক্তি এলো যাদের এ অধম চিনতে পারলাম না। তারা সবুজ কালি দিয়ে মসজিদের দরজার উপরিভাগে কিছু আয়াত লিখছে। তখন এ অধম সেই আয়াতগুলো পড়তে শুরু করলাম। এগুলোর মাঝে

একটি আয়াত আমার মনে রইলো। আর তা হলো, **'লা রাআদ্দা লিফাযলিহী"** অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে খোদার ফযলকে (অনুগ্রহকে) কে বাধা দিতে পারে? (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-১১২)

৬। একবার উম্মুল মু'মেনীন (রাযি আল্লাহুতাআলা আন্হা) অসুস্থ হলেন এবং প্রায় চল্লিশ দিন অসুস্থ ছিলেন। হযরত সাহেব (অর্থাৎ সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম) বলেন, এ মসজিদ সম্পর্কে ইলহাম হয়েছে **"মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারাকিন ইয়ুজয়আলু ফীহি"**। এতে গিয়ে ঔষধ দাও। তিনি (আঃ) এখানে এসে ঔষধ পান করালেন। দু'ঘন্টার মধ্যে উম্মুল মু'মেনীন (রাযী আল্লাহুতাআলা আন্হা) সুস্থ হয়ে গেলেন। (আল্-ফযল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ ইং, পৃষ্ঠা-৬)

৭। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলতেন, "আমাদের মসজিদকে (মসজিদে মোবারককে) আল্লাহ্তাআলা নূহের নৌকার সদৃশ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এটা আকৃতিতেও নূহের নৌকার ন্যায়।" (সীরাতুল মাহ্দী তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭, বর্ণনা-৭৯৫)

৮। "হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ অধম নামাযে বিশেষভাবে সেজদায় লোকদের আজ কালকার তুলনায় অনেক বেশি কাঁদতে শুনলাম। কান্নার শব্দ মসজিদের প্রত্যেক কোন থেকে শুনা যেতো। আর হযরত সাহেব (আঃ) এ কান্নাকে গর্বের সাথে উল্লেখ করেন।" (সীরাতুল মাহ্দী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১১৬, বর্ণনা ৬৬৬)

৯। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহুল মাওউদ রাযী আল্লাহুতাআলা আনহু বর্ণনা করেন, একবার গুজরাটের অধিবাসী এক হিন্দু কোন এক বর যাত্রীর সাথে কাদিয়ানে আসলো। এ ব্যক্তি সম্মোহনী বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। সে সঙ্গী-সাথীদের বললো, আমরা কাদিয়ানে এসেছি। চল, মির্যা সাহেব (আঃ) এর সাথে দেখা করে আসি। লোকদের সামনে হযরত সাহেবের (আঃ) উপর তার সম্মোহনী

বিদ্যার প্রভাব খাটিয়ে তাঁর (আঃ) দ্বারা ভরা মজলিসে কোন অবাঞ্ছিত কাজ করিয়ে নেওয়াটাই ছিল তার ইচ্ছা। সে যখন মসজিদে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করলো তখন সে নিজের বিদ্যা দ্বারা তাঁর (আঃ) উপর প্রভাব খাটাতে শুরু করে দিল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর সে অকস্মাৎ কেঁপে উঠলো। যা হোক নিজকে সামলিয়ে নিয়ে সে বসে পড়লো এবং তার কাজ আবার শুরু করে দিল। আর এদিকে হযরত সাহেব (আঃ) আলাপ-আলোচনায় মগ্ন রইলেন। আবারো তার শরীরে এক ভয়ানক কম্পন দেখা দিল এবং তার মুখ থেকেও কিছু ভীতির শব্দ বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু সে নিজকে সামলে নিল। যা হোক, কিছুক্ষণ পরে সে একটি চিৎকার দিল এবং আতঙ্কে মসজিদ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। জুতা না পরেই সে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেল। অন্যান্য লোকেরাও তার পেছনে ছুটলো এবং তাকে ধরে সামাল দিল। হুঁস ফিরে পাওয়ার পর সে বর্ণনা করলো, আমি সম্মোহনী বিদ্যায় খুব পারদর্শী। আমি মির্যা সাহেব (আঃ) এর উপর আমার সম্মোহনী বিদ্যা প্রয়োগ করতে মনস্থ করেছিলাম এবং মজলিসে তাঁকে দিয়ে কোন বাজে কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যখন সম্মোহনী বিদ্যা প্রয়োগ করতে শুরু করলাম তখন দেখলাম আমার সামনে কিছুটা দূরে একটি বাঘ বসে আছে। বাঘটি দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু আমি মনে মনেই নিজকে এ বলে তিরষ্কার করলাম এটা আমার ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে আমি যখন আবার মির্যা সাহেব (আঃ) এর উপর সম্মোহনী বিদ্যা প্রয়োগ করতে শুরু করলাম তখন আমি সেই বাঘটিকেই আবার আমার সামনে দেখলাম। আরো দেখলাম বাঘটি আমার কাছে এসে গেছে। এতে আমার দেহে আবারো ভয়ানক কম্পন দেখা দিল। এবারো আমি নিজকে সামলে নিলাম এবং মনে মনে আমি নিজকে এ বলে ভৎসনা করলাম যে ভুল ধারণার দরুন আমার হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনকে শক্ত করে এবং সকল শক্তি একত্রিত করে আবার মির্যা সাহেবের উপর আমার সম্মোহনী বিদ্যার প্রভাব প্রয়োগ করলাম। আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলাম। তখন আমি হঠাৎ দেখলাম

সেই বাঘটি লাফ দিয়ে আমাকে আক্রমণ করেছে। এ সময় আমি হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে চিৎকার দিলাম এবং সেখান থেকে ছুটে দৌড়ালাম। পরবর্তীতে এ ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বড় ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যতদিন সে জীবিত ছিল ততদিন সে তাঁর (আঃ) সাথে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছিল। (সীরাতুল মাহ্দী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩, বর্ণনা নম্বর ৭৫)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন, যে সকল লোক কাদিয়ানে আসেন তাদের উচিত তারা যেন প্রত্যহ কোন না কোন নামায মসজিদে মোবারকে আদায় করেন

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহুল মাওউদ রাযী আল্লাহুতাআলা আনহু ১৯৪৪ সালের ৯ই মার্চ আসরের নামাযের পর মসজিদে মোবারকে এ মসজিদ সম্পর্কেই বলেছিলেন ঃ

'যে সকল লোক কাদিয়ানে আসেন তাদের উচিত তারা যেন প্রত্যহ কোন না কোন নামায মসজিদে মোবারকে আদায় করেন।'

'এটা বরকতদানকারী জায়গা। এটা বরকত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান এবং যে সকল কাজ এখানে করা হবে তা কল্যাণমন্ডিত হবে। এ কথা কোন মানুষ বলছে না, বরং খোদা বলছেন। খোদা যদি কোন কিছুকে একবারও কল্যাণমন্ডিত সাব্যস্ত করেন তবুও এর বরকতকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ মসজিদতো সেই মসজিদ, যাকে খোদা বারবার বরকতমন্ডিত বলেছেন। আর কেবল এ কথাই বলেননি এ মসজিদ বরকতদানকারী এবং বরকত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, বরং এ কথাও বলেছেন, যে সকল কাজ এ মসজিদে করা হবে সেগুলোও বরকতমন্ডিত হবে। এর অর্থ হলো, এ মসজিদে যে নামায আদায় করা হবে সেই নামায বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে সেজদা দেয়া হবে তা বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে কেয়াম করা হবে তা বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে তাশাহ্হুদ করা হবে তা বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে সালাম দেয়া হবে তা বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে তাক্বীর দেয়া হবে তা

বরকতমন্ডিত হবে। এ মসজিদে যে সকল দোয়া করা হয় সেগুলো বরকতমন্ডিত হবে। যে মসজিদে এত বরকত, এত মহা বরকত অবতীর্ণ হয় সেই সব বরকত থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে যায় তার চেয়ে বেশি বঞ্চিত ও হতভাগা আর কে হতে পারে?' (আল্ ফযল ১৬ই, এপ্রিল ১৯৪৪ইং, খন্ড ৩২, পৃষ্ঠা-১)

উপরোল্লিখিত ইলহামসমূহ ও উপদেশসমূহের মাধ্যমে মসজিদে মোবারকের গুরুত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা গেল। সম্মানিত বন্ধুগণের এতে অনেক দোয়া করা উচিত। সালানা জলসা চলাকালীন দিনগুলোতে মহিলাগণ মসজিদে মোবারকে বাজামাত নামায আদায় করে থাকেন এবং পুরুষগণ নামায আদায় করেন মসজিদে আক্সায়।

ফরয নামাযগুলোর সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে পুরুষগণ মসজিদে মোবারকে নফল নামায আদায় করতে পারেন। সালানা জলসার দিনগুলো ছাড়া বাকী দিন গুলোতে এ মসজিদ বাজামাত নামায আদায়ের জন্য এবং নফল নামাযের জন্য সদা-সর্বদা খোলা থাকে।

লাল কালির নিদর্শনওয়ালা কক্ষ

মসজিদে মোবারকের আদি অংশের পশ্চিম দিকে সিঁড়ির সাথে এই কক্ষ অবস্থিত। ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই মোতাবেক ১৩০২ হিজরীর ২৭শে রমযান মাসের কথা। সেই সময় এ কক্ষ গোসলের জায়গা রূপে ব্যবহৃত হতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এ কক্ষে পূর্ব-পশ্চিমে পাতা একটি চারপাইয়ে বিশ্রাম করছিলেন। তাজা প্লাষ্টারের দরুন কক্ষটি কিছুটা ঠান্ডা ছিল। চারপাইয়ে কোন বিছানা ও বালিশ ছিল না। হযরত আকদাস আলাইহিস সালাম বাম কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। বাম কনুই মাথার নিচে রাখা ছিল এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল ডান হাত দ্বারা ঢাকা ছিল। আর হযরত (আঃ)এর একনিষ্ঠ খাদেম মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানাউরী নিচে বসে হযরত (আঃ) এর পা টিপছিলেন। এমন সময় হযরত আকদাস (আঃ) কাশ্ফী অবস্থায় (দিব্য দর্শনে) দেখেন ভবিষ্যৎ যুগে সংঘটিত হবে এমন কোন কোন অমোঘ সিদ্ধান্ত হযরত (আঃ) নিজ হাতে লেখেন এবং তা দস্তখত

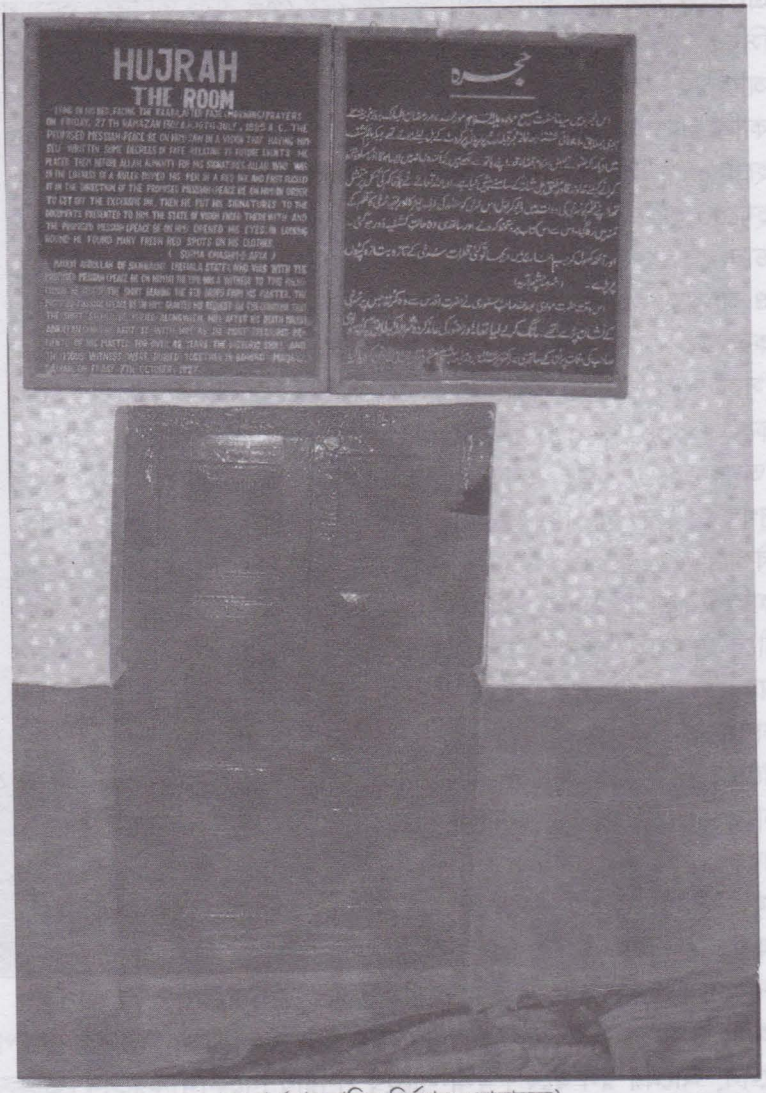

হুযরা (লালকালির নির্দশন ওয়ালাকক্ষ)

করানোর জন্য সর্বশক্তিমান খোদাতাআলার সামনে পেশ করেন। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ -অনুবাদক) হাকিমের আসনে আসীন ছিলেন। তিনি তাঁর কলম লাল কালির দোয়াতে ডুবিয়ে প্রথমে এ লাল কালি তাঁর (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের) দিকে ঝাড়লেন

এবং অবশিষ্ট লাল কালি কলমের মুখে রয়ে গেল এবং তা দিয়ে অমোঘ সিদ্ধান্তসমূহ লেখা পুস্তকে দস্তখত করে দিলেন। খোদার আলৌকিকতার নিদর্শন দেখ। ঐ দিকে কাশ্‌ফী জগতে কলমের লাল কালি ঝাড়া দেয়া হলো এবং এদিকে তা বাহ্যিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেল। মুন্সী সাহেব ভীষণ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে স্বচক্ষে দেখেন, হুযূরের হাঁটুর উপর লাল কালির একটি ফোটা পড়ে রয়েছে। তিনি তার ডান হাতের তর্জনী এ ফোটার উপর রাখলেন। এতে সেই ফোটা হাঁটু ও আঙ্গুলেও ছড়িয়ে পড়লো। তখন তিনি নিজ হৃদয়ে এ আয়াত স্মরণ করলেন- "সিবগাতাল্লাহি ওয়া মান আহ্‌সানু মিনাল্লাহি সিবগাতান' (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৩৯) অর্থঃ আল্লাহ্‌র রং আমরা গ্রহণ করেছি এবং রং এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হতে উত্তম কে হতে পারে?- (অনুবাদক)। তিনি ভাবলেন, এটা যখন আল্লাহ্‌র রং তখন এতে সুগন্ধও থাকবে। কিন্তু এতে সুগন্ধ ছিল না। তখনও তিনি অবাক বিস্ময়ের ঘোরে ছিলেন। এমন সময় তিনি হুযূরের জামাতেও লাল কালির কয়েকটি তাজা ছিটা দেখতে পেলেন। তিনি অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে চারপাই থেকে উঠলেন এবং এ সকল ফোটার সন্ধানে ছাদের আনাচে-কানাচে তন্ন তন্ন করে দেখলেন। এ সময় তিনি একথাও ভাবলেন, হয়তবা টিকটিকির লেজ কেটে যাওয়ার দরুন এ রক্ত পড়েছে। কিন্তু তা ছিল সর্বশক্তিমান খোদার কাশ্‌ফী মো'যেযা। বাহ্যিক ভাবে এর সূত্র পাওয়া কীভাবে সম্ভব? বেচারা চারপাই এ বসে গেলেন এবং আবার পা টিপার খেদমতে লেগে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরে হুযূর (আঃ) কাশ্‌ফের জগত থেকে জেগে গেলেন এবং মসজিদে মোবারকে চলে আসেন। মুন্সী সাহেব আবার পা টিপতে শুরু করলেন। এ ফাঁকে তিনি হযরতকে প্রশ্নও করে বসলেন, হুযূর আপনার (আঃ) উপর এ লাল কালি কোথা থেকে পড়েছে? হুযূর অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, আমের রস হবে। মুন্সী সাহেব পুনরায় নিবেদন করলেন, এটা আমের রস নয়। এটাতো লাল কালি। এতে হুযূর (আঃ) তাঁর পবিত্র মাথা সামান্য উঠিয়ে বলেন, 'কিথ্‌থে হ্যায়' অর্থাৎ কোথায়। মুন্সী সাহেব জামার সেই চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, এইতো সেই লাল কালি। এতে হুযূর (আঃ) জামা সামনের দিকে টেনে এনে এবং নিজের মাথা সেদিকে ঘুরিয়ে ফোটা দেখলেন। এরপর (মুন্সী সাহেবের বর্ণনা

অনুযায়ী) পূর্বেকার বুযূর্গগণের কিছু ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, খোদার সত্তা পর্দার অন্তরালেরও অন্তরালে। তাঁকে এ চোখ দিয়ে পৃথিবীতে দেখা যায় না। অবশ্য তাঁর কোন কোন গুণ 'জামালী' বা 'জালালী'ভাবে (অর্থাৎ স্নেহময়রূপে বা রুদ্ররূপে-অনুবাদক) মূর্তিমান হয়ে বুযূর্গগণকে দেখিয়ে দেয়া হয়। খোদা-দর্শন এবং কাশ্‌ফী বিষয়ের বাহ্যিক বিকাশ সম্পর্কে ঘটনাবলী উল্লেখ করার পর হযরত আকদাস (আঃ) কাশ্‌ফটি তাকে বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দেন। বরং খোদা নিজের পবিত্র হাতে কাশ্‌ফে কলম ঝাড়ার ও দস্তখত করার চিত্রও আঁকেন এবং, সেভাবে কলম ঝাড়া দিয়েও দেখিয়ে দিলেন। হযরত (আঃ) মুন্সী সাহেবকে বলেন, আপনি নিজের জামা ও টুপি দেখে নিন, এগুলোতেও লাল কালির ফোটা পড়েছে কীনা। তিনি জামা দেখলেন। তা সম্পূর্ন পরিষ্কার ছিল। কিন্তু মলমলের সাদা টুপির উপর এক ফোটা পড়ে ছিল। মুন্সী সাহেব বিনয়ের সাথে আবেদন করলেন, হুযূর আপনার এ সম্মানপ্রাপ্ত জামাটি তবারক স্বরূপ আমাকে দান করুন। হযরত আকদাস কেবল তাঁর সেবকদের সাথেই নয়, তাঁর শত্রুদের সাথেও স্নেহ ও বদান্যতার আচরণ করতেন। কিন্তু তিনি (আঃ) মুন্সী সাহেবের এই আবেদন নাকচ করে দিলেন এবং বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার মৃত্যুর পর এর দ্বারা শির্‌ক ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা একে জেয়ারতগাহ্ বানিয়ে এর পূজা শুরু করে দিবে। তিনি নিবেদন করলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবারকসমূহও তো সাহাবাগণ রাখতেন। এতে শির্‌ক ছড়ায়নি। হযরত আকদাস বললেন, 'মিঞা আব্দুল্লাহ্ প্রকৃত কথা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবারকসমূহ যে সকল সাহাবীর কাছে ছিল তাঁরা মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন সেই সব তবারক যেন তাদের মরদেহের সাথে দাফন করে দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এমনটিই করা হয়েছিল। যে তবারক যে সাহাবীর কাছে ছিল তা তাঁর মরদেহের সাথে দাফন করে দেয়া হয়েছিল।' তিনি আবেদন করলেন, হুযূর আমিও মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে যাব। এতে হযরত আকদাস বলেন, 'হাঁ যদি এই প্রতিজ্ঞা কর তবে নিয়ে নাও।' হযরত (আঃ) জুমুআর জন্য কাপড় বদলালেন এবং এ জামা মুন্সী সাহেবের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। এ সম্মানপ্রাপ্ত জামার কাপড়কে

'নেনু' বলা হয় এবং কালির রংটি ছিল হালকা এবং গোলাপী। তেতাল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এ রং এ সামান্য পরিবর্তনও হয়নি।

বাইতুল ফিক্‌র

বাইতুল ফিক্‌র সেই কক্ষ, যা মসজিদে মোবারক সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত। আর এই কক্ষের প্রস্থ প্রায় দশ ফুট এবং দৈর্ঘ্য তের ফুট ছয় ইঞ্চি। এ কক্ষে প্রবেশের জন্য মসজিদে মোবারকের জানালা ছাড়াও পশ্চিম দিকে একটি দরজা এবং উত্তর দিকে অন্য একটি দরজা রয়েছে। এটা সেই বরকতমন্ডিত কক্ষ, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম শুরুর দিকে প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে নিমগ্ন থাকতেন। এ কক্ষেই তিনি (আঃ) তাঁর জ্ঞানপূর্ণ ও অসাধরণ গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণয়ন করেন। এ কক্ষ সম্পর্কে ১৮৮২ সালে হুযূরের (আঃ) কাছে ইলহাম হয়েছিল, **'আলাম নাজয়াল লাকা সুহুলাতান ফী কুল্লি আমরিন বাইতুল ফিকর** (তাজকেরা পৃষ্ঠা ১০৫)। 'আমরা কি সকল বিষয় তোমার জন্য সহজ করে দেইনি? আর তোমাকে বাইতুল ফিক্‌র দান করেছি।'

বাইতুল ফিক্‌র

এই কক্ষ দোয়া ও নফল আদায়ের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। ফরজ নামাজগুলোর সময় মহিলাগণ এ কক্ষে নামায আদায় করে থাকেন। অবশিষ্ট সময় পুরুষগণও এ কক্ষে নফল আদায় করতে পারেন। নফল নামাযের সময় না থাকলে হাত উঠিয়ে 'মসনুন' পন্থায় দোয়া করা যেতে পারে।

হযরত আম্মাজান রাযী আল্লাহুতাআলা আন্‌হার দালান

বাইতুল ফিক্‌রের উত্তর দিকে তুলনামূলকভাবে একটি বড় কক্ষ রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় তেইশ (২৩) ফুট এবং প্রস্থ বার (১২) ফুট। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এ কক্ষ সম্পর্কে বলেন, 'বাইতুদ্‌দোয়া সংলগ্ন পূর্বে অবস্থিত দালানটি খুবই ঐতিহাসিক ও পবিত্র। এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন এবং পরবর্তীতে হযরত আম্মাজান এখানেই থাকতেন। এখানে অনেক ইলহাম হয়েছে। বরং আম্মাজান (রাঃ) এ কক্ষকে বাইতুল ফিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে

হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর দালান

থাকেন। তিনি আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামও এ কক্ষকে বাইতুল ফিক্‌রের অংশ বলে গণ্য করতেন।

এ কক্ষও দোয়া ও নফল আদায়ের জন্য খোলা থাকে। (পরিশিষ্ট, আসহাবে আহমদ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১)

বাইতুদ্‌দোয়া

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আন্‌হু লিখেনঃ

"দোয়ার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলইহিস সালামের একটি বৈশিষ্ট ছিল, তিনি সফরেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন দোয়ার জন্য একটি

বিশেষ জায়গা তেরী করে নিতেন এবং একে বাইতুদ্‌দোয়া বলা হতো। আমি হযরত (আঃ) এর সাথে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি তিনি (আঃ) দোয়ার জন্য একটি পৃথক জায়গা অবশ্যই ঠিক করে নিতেন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচীতে সর্বদা এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতো, একটি সময় দোয়ার জন্য পৃথক করে নিতেন। কাদিয়ানে শুরুর দিকে তিনি (আঃ) তাঁর সেই গৃহে দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন, যা তাঁর (আঃ) থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল। এরপর বাইতুয জেকেরকে (মসজিদে মোবারকে) এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত করা হলো। আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছা যখন বাইতুয জিকেরকেও সাধারণ ইবাদতের স্থান বানিয়ে দিল এবং নির্জনতা আর রইলো না তখন তিনি (আঃ) ঘরে একটি বাইতুদ্‌দোয়া তৈরী করেন। এই বাইতুদ্‌দোয়া এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যখন ভূমিকম্প এলো এবং হুযূর (আঃ) কিছু দিনের জন্য বাগানে চলে গেলেন তখন সেখানেও এ উদ্দেশ্যে একটি কক্ষ নির্মাণ করে নেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে (আঃ) কিছুদিনের জন্য গুরুদাসপুরে থাকতে হয়েছিল। সেখানেও তাঁর (আঃ) জন্য বাইতুদ্‌দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।" (সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাহিস সালাম, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫)

উপরোল্লিখিত বাইতুদ্‌দোয়াসমূহের মাঝে সেই কক্ষটিও "বাইতুদ্‌দোয়া," যার ভিত্তি হুযূর (আঃ) তাঁর মৃত্যুর কমবেশি পাঁচ বছর আড়াই মাস পূর্বে রেখেছিলেন। হযরত আম্মাজান (রাঃ) এর দালানের পশ্চিম দিকে এ ছোট খাটো কক্ষটি অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফুট। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এর দু'টি দরজা রয়েছে। হযরত আম্মাজানের (রাঃ) দালান থেকে এতে প্রবেশের জন্য কাঠের তৈরী সিড়ির চারটি ধাপ চড়তে হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এই বাইতুদ্‌দোয়া নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখেন ঃ

"আমি ভাবলাম জীবনের কোন ভরসা নেই। আমার বয়স প্রায় সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত নেই। খোদা জানেন মৃত্যু কখন এসে যাবে। কিন্তু আমার কাজ এখনো অনেক বাকী রয়ে গেছে। এ দিকে কলমের শক্তি দূর্বল হয়ে এসেছে। অস্ত্র ধারণের

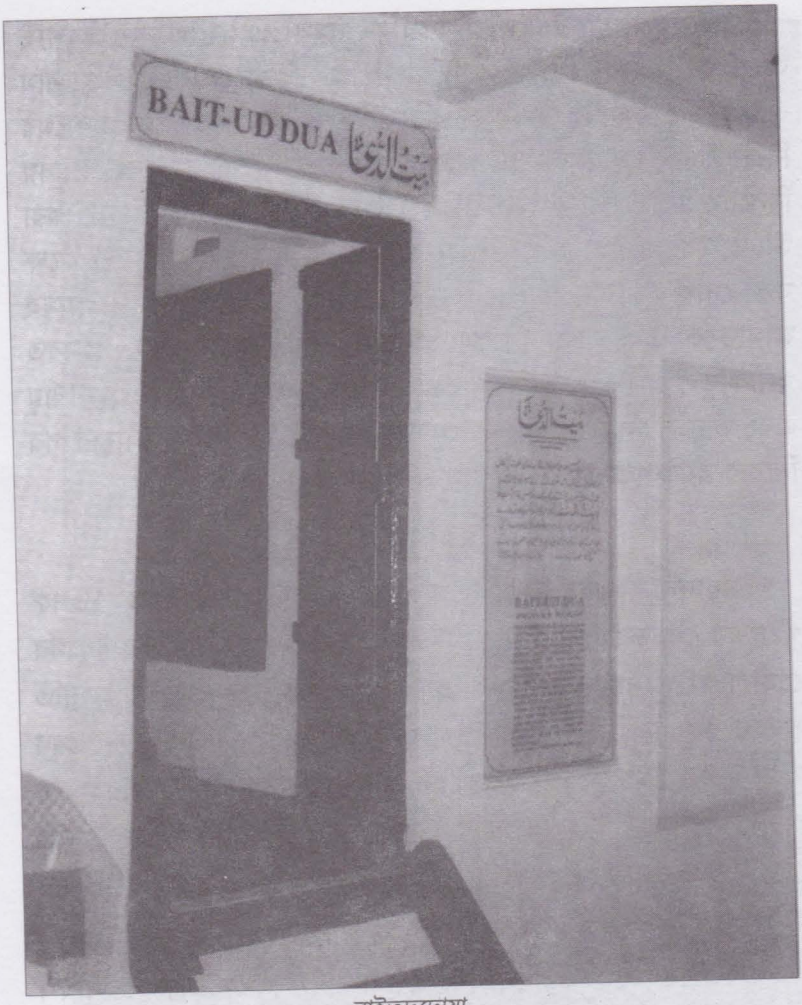

বাইতুদ্‌দোয়া

ব্যাপারে খোদাতাআলার সম্মতি ও ইচ্ছা নেই। অতএব আমি আকাশের দিকে হাত উঠালাম এবং তাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভের জন্য একটি পৃথক কক্ষ তৈরী করলাম। আর খোদার কাছে দোয়া করলাম যেন আমার গৃহ সংলগ্ন এ মসজিদকে এবং বাইতুদ্‌দোয়াকে শান্তি ও নিরাপত্তার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে বিজয়ের গৃহ বানিয়ে দেন।" (জিক্‌রে হাবিব, লেখক: হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব, পৃষ্ঠা-১০৯)।

বাইতুদদোয়াতে দোয়া করার সময় এ লক্ষ্যকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এটা নির্মাণের সময় বর্ণনা করেছিলেন। সব চেয়ে প্রথমে ইসলামের বিজয় এবং আহমদীয়াতের জন্য বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করা উচিত। আর বিশেষভাবে এ দোয়া করা উচিত, হে আল্লাহ! হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম এ কক্ষে যত দোয়া করেছিলেন এর সবগুলো কবুল করে এর ফলসমূহ জামাতকে এবং সারা বিশ্বের মানুষকে দান করতে থাক। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আইয়াদাল্লাহুতাআলাকে সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, দীর্ঘায়ূ এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্যকে সফলতা দান কর। এ সকল দোয়ার পর নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্যও দোয়া করা উচিত।

বাইতুর রিয়াযত (সাধনার গৃহ)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতে একজন পবিত্র বুযূর্গের চেহারা স্বপ্নে দেখেন। এ বুযূর্গ হুযূর (আঃ) কে বলেন, স্বগীয় জ্যোতি লাভের জন্য কিছুদিন রোযা রাখা নবী পরিবারের রীতি। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে হুযূর যেন আহ্লে বয়াতে রেসালতের সুন্নত আদায় করেন। অতএব তিনি (আঃ) আট অথবা নয় মাস পর্যন্ত গোপনীয়তার সাথে রোযা রাখার সাধনা করেন। নিম্নলিখিত ভাষায় হুযূর (আঃ) এর বর্ণনা দেন ঃ

"অতএব আমি কিছুদিন পর্যন্ত রোযা রাখা সমীচীন মনে করলাম। কিন্তু সাথে সাথে এ ধারণাও মনে এলো এই রোযা গোপনীয়তার সাথে পালন করা উত্তম হবে। সুতরাং আমি এ পদ্ধতি অবলম্বন করলাম, পুরুষ মহল থেকে নিজের খাবার চেয়ে নিতাম এবং সেই খাবার গোপনীয়তার সাথে কিছু এতীম শিশুকে দিয়ে দিতাম। এসব এতীম শিশুকে আমি পূর্বেই যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলে দিয়েছিলাম। এভাবে সারাদিন রোযা রাখতাম এবং খোদাতাআলা ছাড়া এ সকল রোযার কথা কেউ জানতো না। অতঃপর দু'তিন সপ্তাহ

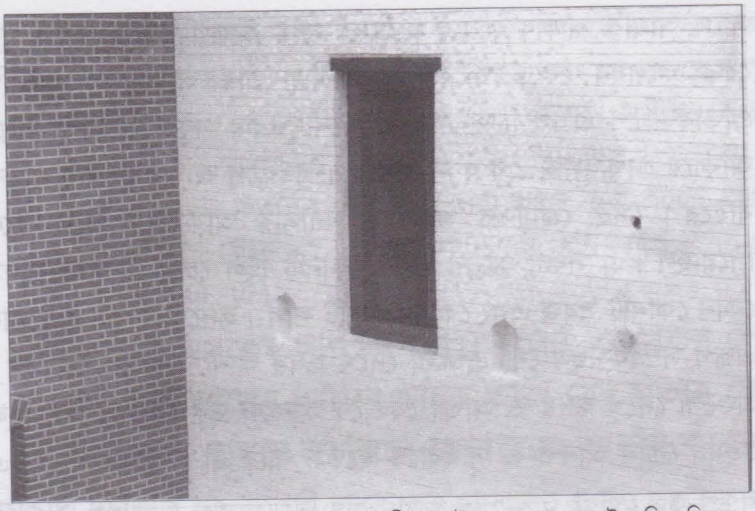

বায়তুর রিয়াযতের ঐ জানালা যা দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খাবার বাইরে দিয়ে দিতেন

পরে আমার মনে হলো, এ যে এক বেলা পেট ভরে রুটি খেয়ে রোযা রাখছি এতে তো আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না। খাবার কিছুটা কমিয়ে খাওয়াটাই উত্তম হবে। অতএব সেদিন থেকে আমি খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিতে থাকি। এমনকি আমি সারাদিনে ও রাতে কেবল একটি রুটি দ্বারা খাবার কাজ চালিয়ে দিতে থাকি। আর এভাবেই আমি খাওয়া কমিয়ে দিতে থাকলাম। এমনকি ২৪ঘন্টায় আমার খাবার ছিল সম্ভবত কয়েকতোলা রুটি। প্রায় আট নয় মাস পর্যন্ত আমি এমনটিই করেছি। যে ক্ষেত্রে দু'তিন মাসের একটি শিশুও এ সামান্য খাদ্যে ধৈর্য ধরতে পারেনা সেক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলা আমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। আর এ ধরনের রোযার আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলীর যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা হলো সূক্ষ্ম দিব্যদর্শন দেখা। প্রকৃতপক্ষে অতীতের কোন কোন নবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আর এ উম্মতের উচুঁ পর্যায়ের যে ওলী-আল্লাহ্গণ গত হয়েছেন তাঁদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার ঠিক জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, একই সাথে হাসান, হুসাইন, আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা রাযীআল্লাহু আন্হাকে দেখলাম। এটা স্বপ্ন ছিলনা, বরং এক ধরনের জাগ্রত অবস্থা ছিল। এভাবে কয়েকজন পবিত্র ব্যক্তির

সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এঁদের কথা উল্লেখ করতে গেলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে। এতদ্বতীত তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতি প্রতিবিম্বরূপে এরূপ চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর সবুজ ও লাল স্তম্ভের আকারে দেখছিলাম এর বর্ণনা দেয়া সম্পূর্ণরূপে আমার লেখনী শক্তির বাইরে। সেই জ্যোতির স্তম্ভসমূহ সরাসরি আকাশের দিকে চলে গিয়েছিল। এ সকল স্তম্ভের কোন কোনটি ছিল চোখ ধাঁধানো সাদা, কোন কোনটি সবুজ এবং কোন কোনটি লাল। হৃদয়ের সাথে এগুলোর এরূপ সম্পর্ক ছিল যে, এগুলো দেখে হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছিল। এগুলো দেখে হৃদয় ও আত্মা যেভাবে আনন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল তেমন কোন আনন্দ এ পৃথিবীতে হতেই পারে না। আমার ধারণা এ সকল স্তম্ভ খোদা ও বান্দার ভালবাসার মিশ্রণে এক প্রতিবিম্ব আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং অন্যটি ছিল সেই জ্যোতি যা উপর থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর উভয়ের মিলনের দরুন একটি স্তম্ভের আকার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা আধ্যাত্মিক বিষয়। জগদ্বাসী এটা জানে না এবং বুঝেও না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যাদের এ বিষয়ে জ্ঞাত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এতগুলো রোযা রাখার দরুন যে সকল আশ্চর্য্যজনক ঘটনাবলী আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো ছিল বিভিন্ন ধরণের কাশ্‌ফ (দিব্য দর্শন)"। (কিতাবুল বারীয়া, পৃষ্ঠা-১৬৪)

হুযূর (আঃ) যে কক্ষে আট বা নয় মাস রোযা রাখেন তাকে 'বাইতুর রিয়াযত' বলা হয়। নফল আদায়ের এবং দোয়া করার জন্য এ কক্ষও খোলা থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের পৈতৃক গৃহ অর্থাৎ 'আদ্-দার' এর একটি কক্ষে হুযূর ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ইং ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আল্ মুসলেহ্ মাওউদ রাযী আল্লাহুতাআলা আন্হু যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন

'আদ্দার' এর এ বেষ্টনীরই অন্য একটি কক্ষে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব রাযী আল্লাহুতাআলা আন্হু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন।

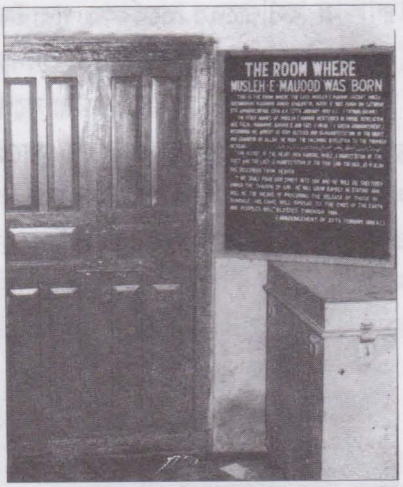

এ কক্ষে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন

মসজিদে আক্সা

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের পিতা মরহুম হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে দুই বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উচুঁ ও সুবিধাজনক জমি সাত শত টাকায় ক্রয় করেন এবং ১৮৭৫ সালে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। একেই "মসজিদে আক্সা" বলা হয়। ১৮৭৬ সালে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। আর সেই সময় না ছিল তাঁর (আঃ) কোন দাবী এবং না জামাত। কাদিয়ানে পূর্ব থেকেই অনেক মসজিদ বিদ্যমান থাকায় এ মসজিদ নির্মিত হতে দেখে কোন এক ব্যক্তি বললো, এত বড় মসজিদের কী প্রয়োজন ছিল? এতে কে নামায পড়বে? এতে চামচিকাই বসবাস করবে। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার ফেরেশতাগণ সেই সময় এ কথা শুনে হেসে থাকবেন এবং বলে থাকবেন, বাহ্যত দেখতে বড় হলেও এ মসজিদ ভীড়ের আধিক্যে সদা-সর্বদা ছোটই হতে থাকবে।

এ মসজিদের পূর্বেকার পুরাতন দালান এবং এর আঙ্গিনা ও কূঁয়া নিজ নিজ জায়গায় সেভাবেই বিদ্যমান রয়েছে যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের যুগে ছিল। ১৮৭৬ সালের ২রা জুনে হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেবের মৃত্যু হলো। তাঁর ওসিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে এ মসজিদ সংলগ্ন এক কোনায় সমাহিত করা হলো (হে আল্লাহ! তুমি তাঁর উপর দয়া কর এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাও)।

মসজিদে আকসা

মসজিদের পূর্বেকার দালানে প্রায় দু'শত লোক নামায আদায় করতে পারতো। পরবর্তীতে যখন আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হলো তখন লোকজন বিপুল সংখ্যায় কাদিয়ানে আসতে লাগলো। তখন এ মসজিদে নামাযীদের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এরপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মসজিদের আঙ্গিনা পূর্বদিকে এতখানি সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দিল যে, হুযূরের শ্রদ্ধেয় পিতার কবর মসজিদের আঙ্গিনায় এসে গেল। আসল কবর মসজিদের বর্তমান আঙ্গিনার ছয়/সাত ফুট নীচে অবস্থিত। এ জন্য কবরের চারদিকে চারটি প্রাচীর নির্মাণ করে একে উপর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা না করে এবং এর অসম্মান না করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মসজিদে আক্সার আঙ্গিনার যে সম্প্রসারণ করা

হয়েছিল তাতে সাদা তারকাচিহ্নিত ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। আর এ চিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্প্রসারণের পর মসজিদে দুই হাজার নামাযীর জন্য স্থান সংকুলান হয়ে গেল। ১৯১০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযীআল্লাহু আন্হুর যুগে মসজিদে আক্সার দালান দ্বিতীয়বার সম্প্রসারিত হলো এবং তৃতীয়বার সম্প্রসারিত হলো ১৯৩৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হুর যুগে। ১৯৩৮ সালের ৭ই জানুয়ারীতে এ মসজিদে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হু জুমুআর খুতবা প্রদানের জন্য প্রথমবার লাউড স্পীকার ব্যবহার করেছিলেন।

মসজিদে আকসার বৈশিষ্ট্যাবলী

মসজিদে আকসার অনেক বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি হলো, এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম নামায আদায় করতেন। বিশেষভাবে মসজিদে মোবারক নির্মিত হওয়ার পূর্বে তো তিনি (আঃ) এই মসজিদে নামায আদায় করেছেন এবং জিক্রে ইলাহীতে নিমগ্ন থাকতেন। এ মসজিদের প্রাচীন অংশের মধ্যবর্তী মেহরাবে হুযূর আলাইহিস সালাম ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল ঈদুল আয্হা উপলক্ষ্যে আরবী ভাষায় ঈদের উপস্থিত (প্রস্তুতিহীন) খুতবা প্রদান করেন, যা 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' নামে অভিহিত।

এ স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' প্রদান করেন

মসজিদে আক্সাতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বরকতমন্ডিত যুগে ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭৫ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে ১৮৯২ সালের সালানা জলসা ব্যতীত (যা খালের তীরে অনুষ্ঠিত হয়) বাকী সকল জলসা মসজিদে আক্সায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হুর মোবারক যুগেও প্রথম দিকের পাঁচটি জলসা মসজিদে আক্সায় অনুষ্ঠিত হয়।

মীনারাতুল মসীহ্

মসজিদে আক্সা এ গর্ব ও সম্মানও লাভ করেছে, সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম "মীনারাতুল মসীহ্" নির্মাণের জন্য এ মসজিদের আঙ্গিনাকে নির্বাচন করেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই মার্চ রোজ শুক্রবার এ মসজিদের আঙ্গিনায় মীনারাতুল মসীহ্র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বরকতমন্ডিত সময়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ করা যায়নি। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আনহু তাঁর খেলাফতের প্রথম বছরেই ১৯১৪ সালের ২৭শে নভেম্বর মীনারাতুল মসীহের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজে নিজের মোবারক হাতে ইট রেখে এর নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ মনোহর ও চিত্তাকর্ষক মিনারের উচ্চতা ১০৫ ফুট। এ মীনারে রয়েছে ৩টি তালা এবং উপরে রয়েছে গম্বুজ। এতে ৯২টি সিড়ির ধাপ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা অনুযায়ী মীনারের উপর সেই সকল নিষ্ঠাবান চাঁদাদাতাগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যারা

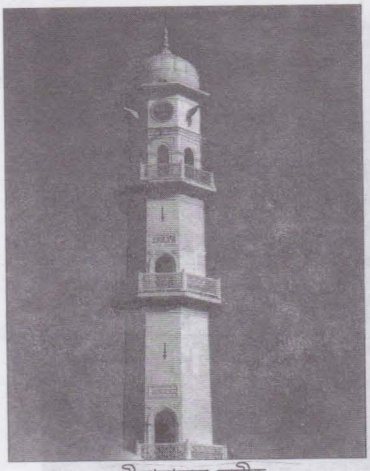

মীনারাতুল মসীহ্

একশত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সেই যুগে কেবল নির্মাণ কাজেই ৫,৯৬৩ টাকা ব্যয় হয়েছিল। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম মীনারাতুল মসীহের নির্মাণের সময় যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। মোয়াজ্জেন এ মীনারে চড়ে দিনে পাঁচবার আযান দিবেন যাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ধ্বনি প্রত্যেক মানুষের কানে পৌঁছে যায়।

২। এ মীনারে একটি বাতি সংযুক্ত করতে হবে যাতে লোকেরা জানতে পারে স্বর্গীয় জ্যোতির যুগ এসে গেছে।

৩। এ মীনারে একটি বড় ঘড়ি সংস্থাপন করতে হবে যাতে মানুষ তাদের নিজেদের সময় চিনতে পারে এবং যাতে তারা সময়কে সনাক্ত করার ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং যাতে মানুষ একথাও বুঝে নেয়, আকাশের দরজা খোলার সময় এসে গেছে।

আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে ও দয়ায় এ মীনারের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এটি এর নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করে চলেছে এবং ইন্শাআল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ করতে থাকবে।

বেহেশ্তী মাকবেরা

কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহের মাঝে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো বেহেশ্তী মাকবেরা। এখানে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের পবিত্র দেহ ১৯০৮ সালের ২৭শে মে, সন্ধ্যা ছয়টার সময় অশ্রুসিক্ত নয়নে পবিত্র মাটিতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আর এটাই হলো সেই কবর, যার মাটিকে হুযূর (আঃ) কে কাশ্ফে রূপালী দেখানো হয়েছিল। হুযূর (আঃ) তাঁর পুস্তক আল্-ওসীয়্যত-এ এ বিষয় উল্লেখ করেছেন। এটাই হলো সেই বেহেশ্তী মাকবেরা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা হুযূর (আঃ) কে এ সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, এটা জামাতের সেই সকল সম্মানিত লোকগণের কবর যারা বেহেশ্তী।

প্রত্যেক আহমদীর এই আকাংখা ও হৃদয়ে এই আবেগ থাকে সে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের মাযারে দোয়া করতে

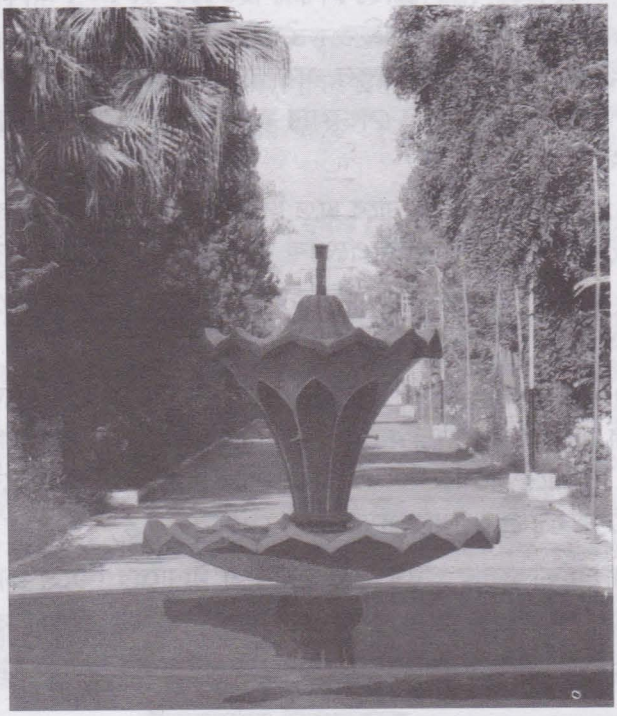

বেহেশতি মাকবেরা

পারে এবং অধিকাংশ নবদিক্ষীত আহমদী এ প্রশ্ন করে থাকেন, তারা কী দোয়া করবেন। তাদের অবগতির জন্যই লিখছি, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী দোয়ার জন্য হাত উঠাবেন এবং সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা ও দুরূদ শরীফ পড়বেন। এরপর নিজ ভাষায় নিম্নবর্ণিত দোয়া সমূহ করবেন।

সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার লোকদের এ আদেশ দিয়েছিলেন, তোমাদের মাঝে যে-ই "মসীহ্ মাওউদ" পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছায়। (দূররে মনসুর, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৪৩)

হে আল্লাহ্ ! আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের কবরে দাঁড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাম তাঁর কাছে

বেহেশতি মাকবেরা

পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ্! ইসলামকে জীবন দানের জন্য তিনি যে জামাতের (আহমদীয়ত) ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কুরআন মজীদ ও হাদীসের যে শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা বেশি থেকে আরো বেশি লোককে গ্রহণ করার সামর্থ্য দান কর। আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে এবং জামাতের সকল ব্যক্তিকে এসকল শিক্ষার উপর আমল করার সামর্থ্য দান কর। হে আল্লাহ্ ! আমাদের যুগ-খলীফার সেরূপ আনুগত্য করার সামর্থ্য দাও যেরূপ আনুগত্য হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হু হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের করেছিলেন। আমাদের বর্তমান ইমাম আইয়াদাল্লাহুতাআলাকে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য ও সহায়তা দান করতে থাক। হে আমাদের প্রভু! এ কবরস্থানে শায়িত সকল মূসীর প্রতি এবং সারা বিশ্বের মূসীগণের প্রতি তোমার করুণা ও দয়া অবতীর্ণ কর এবং আমাদেরও এই কল্যাণমন্ডিত নেযামে (ওসীয়্যতে) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সামর্থ্য দাও। এরপর নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষমার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়েও আল্লাহ্তাআলার দরবারে দোয়া করা যেতে পারে। (আল্লাহ্তাআলা সকলের দোয়া কবুল করুন)। আমীন।

বেহেশ্‌তী মাকবেরায়
বিদ্যমান পবিত্র স্থানসমূহ

বেহেশ্‌তী মাকবেরার বর্তমান আয়াতন প্রায় ১৭ একর। এটা সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতৃপুরুষের বাগান ছিল। পরবর্তীতে আরো কিছু জমি ক্রয় করে এ স্থানকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সর্বপ্রথম হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আন্‌হুকে সমাহিত করা হয়। মৌলভী সাহেব ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর যোহরের নামাযের পর কাদিয়ানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়ান। পূর্ব দিকের খালের জনবসতিতে অবস্থিত সাধারণ কবরস্থানে তাঁকে (রাঃ) আমানত স্বরূপ দাফন করা হযেছিল। ২৬শে ডিসেম্বর নামাযে যোহর ও আসরের পর তাঁর (রাঃ) কাফনের বাক্‌স কবর থেকে বের করা হয় এবং পুনরায়

বেহেশতি মাকবেরার প্রথম কবর {হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ)}

২৭শে ডিসেম্বর সকাল প্রায় দশটার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটি বড় সমাবেশে তাঁর (রাঃ) নামাযে জানাযা আদায় করেন এবং পুনরায় তাঁকে (রাঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরায় দাফন করা হয়। বেহেশ্‌তী মাকবেরায় তাঁর (রাঃ) কবরই সর্ব প্রথম কবর। (সূত্রঃ হায়াতে তাইয়্যেবা, পৃষ্ঠা ২৯৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ১৯০৮ সালের ২৬শে মে লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। ২৭শে মে তাঁকে (আঃ) বেহেশ্‌তী মাকবেরায় সমাহিত করা হয়। তাঁর (আঃ) ডান দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে) হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আনহুর কবর এবং বাম দিকের (পূর্ব দিকের) স্থান খালি রয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মেনীন সৈয়্যদা নূসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা রাযীআল্লাহুতাআলা আনহার দাফনের জন্য এ স্থানটি খালি রাখা হয়েছে। হযরত উম্মুল মু'মেনীন রাযীআআল্লাহুতাআলা আন্‌হা ১৯৫২ সালের ২০/২১ এপ্রিলের মধ্যবর্ত্তী রাতে রাবওয়ায় মৃত্যু বরণ করেন। তিনি (রাঃ) আমানত স্বরুপ বেহেশ্‌তী মাকবেরা, রাবওয়ায় সমাহিত রয়েছেন। তাঁর (রাঃ) ওসীয়্যত ছিল, **"আমাকে কাদিয়ানে পৌঁছাতে হবে, এখানে যেন রেখে দেয়া না হয়।"** (তারিখে আহমদীয়াত, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা-১১৫)

জামাতের বন্ধুগণের সর্বদা দোয়া করা উচিত যেন সেদিন শীঘ্র আসে যখন মরহুমার ওসীয়্যত অনুযায়ী জামাত এ আমানত তাঁর ওসীয়্যতকৃত স্থানে সমাহিত করার সামর্থ্য লাভ করে।

আহমদীয়া জামাতের উন্নতির সাথে সাথে এর বিরোধিতা বেড়ে যাওয়াও এক আবশ্যকীয় বিষয় ছিল এবং এখনো তা-ই। এর ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে কখনো প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। হতে পারে কোন কোন নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী কবরসমূহকে অসম্মান করার চেষ্টা করবে। ১৯২৫ সালের নভেম্বরে হুযূর আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য সাহাবীগণের রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য কোন কোন কবরের চার পাশে প্রাচীর তৈরী করা হলো। অন্য দিকে কোন কোন স্বল্প তরবিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি

এবং অ-আহমদী বন্ধুগণ যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের কবরে ফুল না দেয় এবং শির্কজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন না করে সে জন্য তাদের এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যও চারদিকে প্রাচীর তৈরী করা আবশ্যকীয় মনে করা হয়েছিল।

১৯৫৬/৫৭ সালে বেহেশ্‌তী মাকবেরার বিস্তৃত এলাকার চারপাশেও পাকা প্রাচীর তৈরী করা হয়। এ প্রাচীর নির্মাণের অধিকাংশ কাজ সম্মানিত দরবেশগণ 'ওয়াকারে আমলের' (সেচ্ছাশ্রমের) মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

হযরত আম্মাজান রাযীয়াল্লাহুতালা আনহার ঘর

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র কবরস্থান থেকে যখন আমরা পশ্চিম দিকে যাব তখন সম্মুখে একটি ঘর দেখতে পাওয়া যাবে। এই ঘরকে 'মাকানে হযরত আম্মাজান (রাঃ)' বলা হয়। একে 'দারুল ওয়াকেফীনও বলা হয়। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র মরদেহ লাহোর থেকে কাদিয়ানে এনে ১৯০৮ সালের ২৭শে মে এ ঘরের মধ্যবর্তী কামরায় রাখা হয়েছিল। আর এ কক্ষে বন্ধুগণ তাদের ইমামকে শেষ বারের মত দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক কক্ষকেও দেখা যেতে পারে।

নোট ঃ এ পুস্তিকার বিনীত লেখক মুহাম্মদ হামীদ কাওসার উল্লেখ করছি, এ ঘরের উত্তর-পূর্ব কোনায় একটি গোসলা-খানা ছিল। এর টাংকিতে পানি ঢালার রাস্তা বাইরের দিক থেকে তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ঘটনা। খাকসার দেখলাম হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ) পাকিস্তান থেকে আগত কোন কোন অতিথিকে বলছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় একবার খুব ভোরে আমি দেখলাম হুযূর (আঃ) কূঁয়া থেকে "বুকাতে" (রবার বা চামড়ার বালতিতে) পানি এনে এ টাংকিতে ঢালছিলেন। ভাইজী (রাঃ) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি সেই "বুকা" হুযূর আলাইহিস সালামের হাত থেকে নিয়ে নিলাম এবং এরপর আমি পানি

মাকান হযরত আম্মাজান (রাঃ)-যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র মর-দেহ রাখা হয়

এনে ঢাললাম। এত ভোরে হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সেবককে পানি আনার কষ্ট দিতে চাননি।

বসার জায়গা

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তাঁর নিজ বাগানে সাহাবা কেরামগণের সাথে আসতেন তখন এ উঁচু স্থানে আসতেন এবং সাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মজলিসের অনুষ্ঠান করতেন। আর এর সাথে সাথে ঋতু অনুযায়ী উপস্থিত সাহাবীগণকে তাজা ফল দিয়ে আপ্যায়নও করতেন। ১৯৭২ সালে এ জায়গায় একটি পাকা কক্ষ নির্মাণ করে দেয়া হয় এবং হুযূরের বসার জায়গা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়। এই কক্ষটিও দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে।

জানাযা গাহ্

এ বাগানে সেই স্মরণীয় এবং পবিত্র স্থানও রয়েছে যেখানে জামাতের বন্ধুগণ ১৯০৮ সালের ২৭শে মে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল রাযিআল্লাহুতাআলা আনহুর পিছনে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নামাযে জানাযা আদায় করেন। দুটো 'সারু' বৃক্ষের (ইউক্যালিপটাস জাতীয় বৃক্ষের) মাঝে আজও এ জায়গা দেখা যেতে পারে।

কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল

জানাযা গাহের নিকটেই সেই স্থানটিও অবস্থিত, যেখানে জামাতের বন্ধুগণ ১৩২৬ হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৯০৮ সালের ২৭শে মে মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযীআল্লাহুতাআলা আন্হুকে সর্বসম্মতিক্রমে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রথম খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) স্বীকার করে নিয়ে তাঁর হাতে বয়াত করেছিলেন। আর একেই কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল বলা হয়। ('কুদরতে উলা' শব্দটি নবুওয়তের জন্য এবং 'কুদরতে সানীয়া' খেলাফতের জন্য ব্যবহার করা হয়) অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতে খেলাফতের শুরু এ স্থান থেকেই হয়েছিল, যা ইনশাআল্লাহ্তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারিখে আহমদীয়াত, তৃতীয় খন্ডের ৫৬২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে :

এ প্রথম বয়াত বাগানের কোন্ অংশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এবং আরো কোন কোন মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা যেমন

কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল

মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব, নাযের তালীম, রাবওয়া, মাস্টার ফকীর উল্লাহ্ সাহেব, অফিসার, আমানত, রাবওয়ার রায় অনুযায়ী প্রথম বয়াত হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বাগানে হয়েছিল, যা বাগানের দক্ষিণ অংশে বেহেশ্‌তী মাকবেরা সংলগ্ন। স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী রাযীআল্লাহুতাআলা আনহুর ধারনাও মোটামুটি এটাই ছিল। এর বিপরীত বিশেষভাবে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রাঃ) এবং হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রাঃ) এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণ হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বাগানকে প্রথম বয়াতের স্থান বলে নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করতেন। জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব নামক এক সাহাবীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম বয়াত উভয় স্থানেই হয়েছে। প্রথমে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের বাগানে এবং পরে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রাঃ) এর বাগানে হয়েছে।

আরো কিছু স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক স্থান

গোল কামরা

মসজিদে মোবারকের পূর্ব দিকের বড় সিঁড়ি দিয়ে আরো উপরে উঠলে ডান দিকে একটি গোল কামরা দেখা যাবে। এ ঐতিহাসিক কামরা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রাযীয়াল্লাহুতাআলা আনহু লিখেন:-

"১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মসজিদে মোবারকের পর সম্ভবত দ্বিতীয় নির্মাণ কাজ ছিল গোল কামরার নির্মাণ। মসজিদে মোবারকের পুরাতন সিঁড়ি দিয়ে এর দরজা খোলা হয়। পূর্বে এ কামরা মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং এখানে মেহমানদের খাবার খাওয়ানো হতো। আর কাতেব এখানে বসে পান্ডুলিপি নকল করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এ স্থানেই বন্ধুগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ) পেনশন নিয়ে চলে আসেন। তখন তিনি গোল কামরার সামনে প্রাচীর তৈরী করে পর্দা করে নিলেন এবং এটাকেই তাঁর বসবাসের স্থান করে নিলেন।" (সীরাতুল মাহ্দী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৬) এই ঐতিহাসিক কামরাও দেখা যেতে পারে।

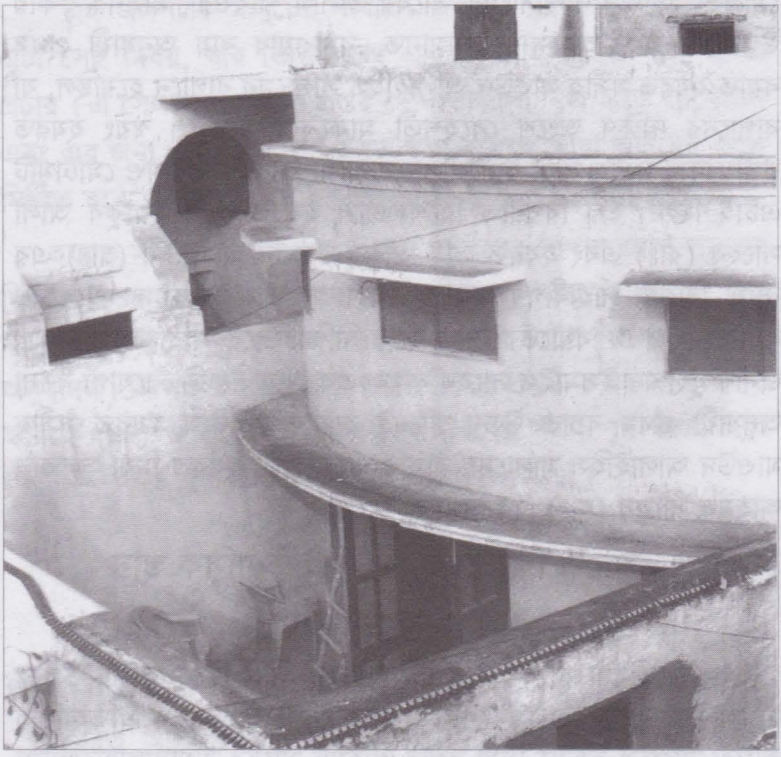

গোল কামরা

প্রাচীর

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের স্থাপিত জামাত যখন উন্নতি করতে আরম্ভ করলো তখন ইবলিসী শক্তিগুলো একে কীভাবে সহ্য করতে পারে? বিরুদ্ধাচরণের জন্য এদের সাধ্যের মাঝে যত পথ খোলা ছিল তার সব কয়টিই তারা গ্রহণ করলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চাচাতো ভাই মির্যা ইমাম উদ্দীন কেবলমাত্র তাঁকে (আঃ) উত্তক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করার জন্য তাঁর (আঃ) গৃহের সামনে ১৯০০ সালের ৫ই জানুয়ারী আট ফুট উঁচু, দশ ফুট লম্বা এবং দেড় ফুট চওড়া একটি প্রাচীর নির্মাণ শুরু করলো। এ প্রাচীর হুযূর আলাইহিস সালামের আঙ্গিনা থেকে শুরু করে মসজিদে মোবারকের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৭ই জানুয়ারীতে এ পীড়াদায়ক প্রাচীরের নির্মাণ

বিরুদ্ধবাদীরা এ কক্ষের সামনেই প্রাচীর নির্মাণ করেছিল

কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণকে মির্যা ইমাম উদ্দীনের কাছে পাঠান। কিন্তু তিনি কোনভাবেই এ প্রাচীর ভাংতে রাজী হননি। অতঃপর তিনি (আঃ) জেলা প্রশাসনের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু সেখানেও ডিপুটি কমিশনারের মনোভাবকে শত্রুতামূলক দেখা গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে দেওয়ানী আদালতে দাবী পেশ করা হলো। ১৯০১ সালের ১২ই আগষ্টে আদালত প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয় এবং ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা চারটার সময় সেই মেথরকে প্রাচীর ভাংতে হলো, যার দ্বারা ইমাম উদ্দীন তা নির্মাণ করিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লিখেন ঃ

"যখন বিরুদ্ধবাদীরা দাবীর সাথে বলতো মোকদ্দমা অবশ্যই খারিজ হয়ে যাবে এবং আমার সম্পর্কে বলতো, আমরা তার সব দরজার সামনে প্রাচীর তৈরী করে এমন কষ্ট দেব যেন সে কারাবন্দী হয়ে পড়ে, এরূপ সময়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। খোদা এ ভবিষ্যদ্বাণীতে সংবাদ দেন, আমি এমন একটি বিষয় প্রকাশ করবো যাতে যে পরাজিত সে বিজয়ী হবে এবং যে বিজয়ী সে পরাজিত হয়ে যাবে।"

"এরপর সিদ্ধান্তের দিন এলো। সেদিন আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা খুব আনন্দিত ছিল। আজ মামলার খারিজ আদেশ শুনানো হবে এবং তারা বলাবলি করছিল, সব ধরনের কষ্ট দেয়ার সুযোগ আজ থেকে আমাদের হাতে এসে যাবে। সেদিনই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার এ অর্থ বোঝা গেল যে, এটা একটি গুপ্ত বিষয়, যার মাধ্যমে মোকদ্দমা ঘুরে যাবে এবং অবশেষে তা প্রকাশ করা হবে। অতএব ঘটনা এমনটিই ঘটলো। সেদিন আমাদের উকিল খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের মনে হলো অতীত উদাহরণের ইনডেক্স অর্থাৎ পরিশিষ্টে গুরুত্বপূর্ণ আদেশাবলীর সার-সংক্ষেপ লেখা থাকে। যখন তা দেখা হলো তখন সে কথা বেরিয়ে এলো, যা বের হওয়ার আশা ছিল না। অর্থাৎ বিচারকের সত্যায়িত সেই আদেশ বেরিয়ে এলো যাতে লেখা ছিল, জমির মালিক কেবল ইমাম উদ্দীন নয় বরং মির্যা গোলাম মোর্তুজা অর্থাৎ আমার পিতাও মালিক। এটা দেখার পর আমাদের উকিল বুঝে গেল মোকদ্দমায় আমাদের জয় হয়ে গেছে। বিচারকের কাছে এটা বর্ণনা করা হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ইনডেক্স চেয়ে পাঠালেন। দেখার সাথে সাথেই বিষয়টি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতএব তৎক্ষণাৎ তিনি মোকদ্দমার খরচসহ ইমাম উদ্দীনের বিরুদ্ধে জমির ডিক্রী প্রদান করে দিলেন।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ২৬৯, ২৭২)

যেখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল সে জায়গা আজও দেখা যেতে পারে এবং নিজেদের ঈমান আলোকিত করা যেতে পারে। কোথায় গেল প্রাচীর নির্মাণকারী? আর যাদের বাধা দেয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল তারাতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হচ্ছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরিবারের পূর্বপুরুষগণের কবরস্থান

হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতৃপুরুষদের প্রাচীন কবরস্থান কাদিয়ানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এ কবরস্থানে হুযূর (আঃ) এর শ্রদ্ধেয়া মাতা চেরাগ বিবি সাহেবার কবর রয়েছে।

তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। হুযূর আলাইহিস সালাম যখনই তাঁর কথা বলতেন তখনই তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর (রাঃ) নিজ চোখে দেখা বর্ণনা হলো, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিজেদের পুরাতন পারিবারিক কবরস্থানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে তিনি (আঃ) আবেগের সাথে নিজের শ্রদ্ধেয়া মাতার মাজারে এলেন এবং নিজ খাদেমগণসহ দীর্ঘ দোয়া করেন এবং তাঁর চোখ পানিতে ভরে গেল (হায়াতে আহ্‌মদ, প্রথম খন্ড, নম্বর ২, পৃষ্ঠা ১৪৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শ্রদ্ধেয় পিতা ও শ্রদ্ধেয় দাদার কাছে এই কবরস্থান এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, হুযূর আলাইহিস সালামের দাদা মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেব যখন কপুরতলাস্থ বেগোয়াল ষ্টেটে আশ্রয় নিলেন এবং ১৮১৪ সালে সেখানেই মারা গেলেন তখন হুযূর (আঃ) এর পিতা হযরত মির্যা গোলাম মোর্তুজা সাহেব তাঁর মৃতদেহ নিজেদের পিতৃপুরুষের কবরস্থানে দাফন করার জন্য রাতারাতি কাদিয়ান নিয়ে আসেন এবং শিখদের বাধা সত্ত্বেও বড় সাহসিকতার সাথে তাঁকে নিজেদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন। (সূত্র : হায়াতে তাইয়েবা, পৃষ্ঠা-৭)

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব রাযীয়াল্লাহুতাআলা আনহু লিখেন:-

"কাদিয়ানের যে কবরস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশের লোকগণ দাফন হতে থাকেন তা স্থানীয় ঈদগাহের কাছে। এটা একটি সুবিস্তৃত কবরস্থান এবং কাদিয়ানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশের যে সকল ব্যক্তির কবরের কথা আমি জানতে পেরেছি এর মাঝে কোন কোন কবরের নক্‌সা মূল উর্দূ পুস্তকে অংকন করা হয়েছে। (কিন্তু অনুদিত এ পুস্তিকায় নক্‌সাটি অংকন করা সম্ভব হয়নি-অনুবাদক।)

এ নক্‌সায় শাহ্ আব্দুল্লাহ্ সাহেব গাজীর কবরও দেখানো হয়েছে। তিনি একজন ফকীর ধরনের বুযুর্গ ছিলেন। আমি এ সংবাদ শেখ নূর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে এ কবরস্থানের ফকির ঝন্ডু শাহের কাছ

থেকে পেয়েছিলাম এবং শাহ্ আব্দুল্লাহ্ গাজী সম্পর্কে আমি মির্যা রশীদ আহমদের কাছ থেকে জেনেছি। তিনি মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের (হযরত সাহেবের প্রপিতামহ) যুগে এক ফকীর ধরনের বুযুর্গ ছিলেন। এ বুযুর্গের মৃত্যুর পর মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব তাঁর মাযার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সহোদরা বোন আমাতুন নাসীরের কবরও এ কবরস্থানেই রয়েছে।"

মসজিদে নূর

দেশ বিভাগের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পূর্বে কাদিয়ানে প্রায় ১২টি মসজিদ ছিল। এ ছাড়া আরো কয়েকটি স্থানেও নামায আদায় করা হতো। দেশ বিভাগের পর মসজিদে মোবারক, মসজিদে আক্সা এবং মসজিদে নাসেরাবাদ এই তিনটি মসজিদে নিয়মিতভাবে বাজামাত নামায পড়া জারী থাকে। এখন আটটি মসজিদে বাজামাত নামায জারী রয়েছে। উপরোল্লেখিত তিনটি মসজিদ ছাড়াও দারুল আনওয়ার, দারুল বরকত, দারুর রহমত, কুঠী দারুস সালাম, দারুল ফতুহ্তেও বাজামাত নামায আদায় করা হয়ে থাকে।

মসজিদে নূরও কাদিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ সমূহের অন্যতম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) ১৯১০ সালের ৫ই মার্চ এ ঐতিহাসিক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর নির্মাণে তিন হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এ অর্থের যোগান দিয়েছিলেন হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ)। এ মসজিদ তালিমুল ইসলাম স্কুল ও কলেজসংলগ্ন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর মৃত্যু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ কুঠী দারুস সালামে। এটা কলেজ ও মসজিদে নূরের উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ এ মসজিদে নূরেই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন সাহেব (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হন এবং প্রায় দু'হাজার লোক সেই সময় তাঁর হাতে বয়াত করেছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর জানাযা হাইস্কুলের উত্তরে অবস্থিত মাঠে পড়িয়েছিলেন।

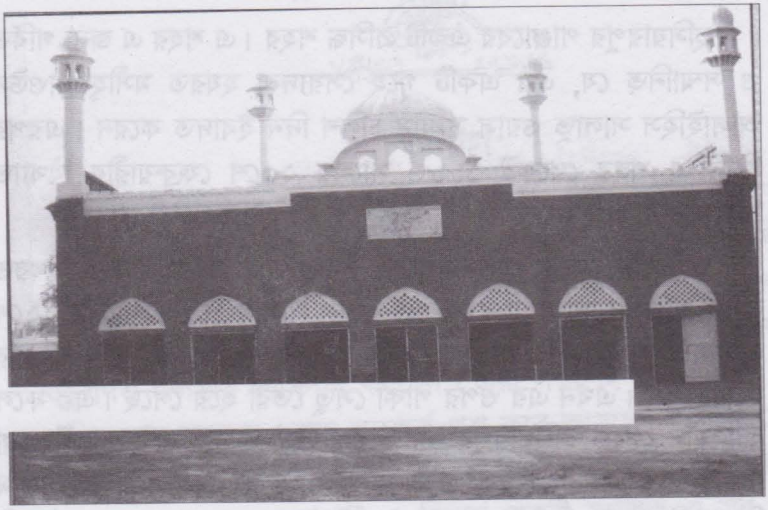

মসজিদে নূর

এটাই সেই ঐতিহাসিক মসজিদ, যেখানে আহমদীয়া জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কুরআন মজীদ, হাদীস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নির্দেশাবলীর অনুসরণে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছিল। আর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে কিছু লোক খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাদিয়ান ছেড়ে লাহোর চলে গিয়েছিল। অতীতের দীর্ঘ সময় এ সত্যকে প্রকাশিত করে দিয়েছে, খেলাফতই উম্মতের জীবিত থাকার ও উন্নতি করার মাধ্যম। এটাই সেই 'হাবলুল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রশি), যা মানুষকে তার প্রভু-প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং মু'মেনদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। যারা এ 'হাবলুল্লাহ্ ' থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল, তারা বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পৃথিবীর গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল।

এ মসজিদও জেয়ারতের জন্য এবং সালানা জলসার দিনগুলোতে খোলা থাকে। উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ছাড়াও বন্ধুগণ নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহও কাদিয়ানে দেখতে পারেন।

লঙ্গরখানা, মেহমানখানা, বর্তমান তালিমুল ইসলাম স্কুল, মাদ্রাসা ও জামেয়া আহমদীয়া, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তরসমূহ, কাসরে খেলাফত, নূর হাসপাতাল, পুরাতন ও নুতন বিল্ডিং সমূহ, গেষ্ট হাউস, দারুল আনোয়ার ছাড়াও আরও অনেক স্থান রয়েছে।

হুসিয়ারপুর

হুসিয়ারপুর পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এ শহর এ জন্য গর্বিত ও সম্মানিত যে, এর একটি গৃহে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চল্লিশ দিন ইবাদত করেন। এরপর তিনি এ শহর থেকেই ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিখ্যাত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

কাদিয়ান থেকে হুশিয়ারপুরের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ১৮৮৬ সালের ২২শে জানুয়ারী হুশিয়ারপুর যাওয়ার সময় নৌকায় করে বিপাশা নদী পার হয়েছিলেন। এখন এর ওপর পাকা সেতু তৈরী হয়ে গেছে। এর ফলে কাদিয়ান থেকে হুশিয়ারপুর ট্যাক্সি যোগে দেড় দুই ঘন্টায় পৌঁছানো যায়। ১৮৮৬ সালের ২২শে জানুয়ারী যখন হুযূর আলাইহিস সালাম চিল্লাকশীর জন্য গিয়েছিলেন তখন তাঁর (আঃ) সাথে হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানাউরী (রাঃ), হযরত শেখ হামেদ আলী সাহেব (রাঃ) এবং মিঞা ফতেহ্ খান সাহেবও ছিলেন। হুশিয়ারপুরের জমিদার শেখ মেহের আলী 'তাবিলা' নামে খ্যাত তার একটি গৃহ খালি করে দিলেন। তিনি (আঃ) এ গৃহের একটি কক্ষে চল্লিশ দিন দোয়া করেন। তিনি (আঃ) নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন কেউ যেন উপর তলায় তাঁর কাছে না যায় এবং খাবার যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি খাবার খেলেন কি না সেজন্য যেন অপেক্ষা করা না হয় এবং খালি বাসন-কোসন যেন অন্য সময় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আরো নির্দেশ ছিল, নামায তিনি একাই ওপরে পড়ে নিবেন এবং বাকী সকলে যেন নীচে পড়ে নেয়। জুমুআর জন্য হযরত সাহেব (আঃ) বলেন, শহরের এক দিকে "কোন বিরান মসজিদ খুঁজে বের কর। সেখানে আমরা পৃথকভাবে নামায পড়বো।" শহরের বাইরে একটি বাগান ছিল। সেখানে একটি মসজিদ ছিল। সেখানে জুমুআর দিন হুযূর (আঃ) চলে যেতেন এবং আমাদের নামাযে ইমামতি করতেন এবং খোৎবাও নিজে পড়তেন।

চিল্লাকশীর পর তিনি (আঃ) আরো বিশ দিন হুশিয়ারপুরে থাকেন। এ দিনগুলোতে লালা মুরুলী ধরের সাথে তাঁর (আঃ) বাহাস্ হয় যা

'সুরমায়ে চাশম আরিয়াতে' লিপিবদ্ধ আছে। দু'মাসের মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে গেল তখন হুযূর সেই রাস্তা দিয়েই কাদিয়ান ফিরে আসেন, যে রাস্তা দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কাদিয়ান পৌঁছে গেলেন। হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ–

"হুশিয়ারপুর থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে এক বুযুর্গের কবর রয়েছে। সেখানে সামান্য বাগান রয়েছে। সেখানে পৌঁছে হুযূর কিছুক্ষণের জন্য গরুর গাড়ী থেকে নেমে আসলেন এবং বললেন, এটা একটা উত্তম ছায়াঘেরা স্থান। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবো। এরপর হুযূর (আঃ) কবরের দিকে চলে গেলেন। আমি পিছনে পিছনে গেলাম। আর শেখ হামেদ আলী ও ফাতেহ্ খান গরুর গাড়ীর কাছে থাকলেন। তিনি (আঃ) কবরস্থানে পৌঁছে এর দরজা খুলে ভিতরে গেলেন। এবং কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে কবরবাসীর জন্য হাত উঠালেন এবং কিছুক্ষণ দোয়া করতে থাকলেন। এরপর তিনি ফিরে এলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি যখন দোয়ার জন্য হাত উঠালাম তখন যে বুজুর্গের এ কবর তিনি কবর থেকে বেরিয়ে নতজানু হয়ে আমার সামনে বসে পড়লেন। আপনি যদি সাথে না থাকতেন তাহলে তাঁর সাথে আমি কথাবার্তাও বলতাম। তাঁর চোখ ডাগর ডাগর এবং রং শ্যামলা।

অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, দেখ এখানে যদি কোন মোতাওয়াল্লী থাকে তাহলে তার কাছে এ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর। হুযূর (আঃ) মোতাওয়াল্লীর কাছে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি এ ব্যক্তিকে স্বয়ং দেখিনি। কেননা ইনি প্রায় একশত বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন। তবে হ্যাঁ, আমার বাপদাদার কাছে শুনেছি, এ ব্যক্তির রং ছিল শ্যামলা এবং চোখ ছিল ডাগর ডাগর এবং এ অঞ্চলে তাঁর খুব প্রভাব ছিল।" (সিরাতুল মাহদী, প্রথম খন্ড, বর্ণনা ৮৬)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহু ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী সঠিক সময়েই জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি (রাঃ) ১৯৪৪সালের ২০শে

ফেব্রুয়ারী কানাকমন্ডীর সুবিস্তৃত মাঠে তাঁর "মুসলেহ্ মাওউদ" হওয়ার ঘোষণা করেন এবং সম্মিলিত দোয়ার জন্য চিল্লাকশীওয়ালা পবিত্র কক্ষে চলে গেলেন। এর বর্ণনা তারীখে আহমদীয়াত, নবম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

পবিত্র কক্ষে সম্মিলিত দোয়া

হযরত সৈয়্যদনা আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁর প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতার পর চিল্লাকশিওয়ালা পবিত্র ও বরকতমন্ডিত কক্ষে চলে গেলেন। সে সময় এ কক্ষটি এক সম্মানিত হিন্দু শেঠ হরকিষণ দাসের মালিকানায় ছিল। তিনি এটা শেখ মেহের আলী সাহেবের কাছ থেকে ক্রয় করে এর ওপর একটি গৃহ নির্মাণ করেন এবং এর ওপরের অংশ সবুজ রং করে দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের চিল্লাকশিওয়ালা কক্ষ এর প্রকৃত আকারে বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু এই সময়েই এবং এ ভিতের ওপরেই একটি কক্ষ নির্মিত ছিল। শেঠ সাহেব খুব খুশি হয়ে এখানে দোয়া করার অনুমতি দিলেন। বরং তিনি নাযের দাওয়াতুদ তবলীগ হযরত মৌলবী আব্দুল মুঘনী খান সাহেবের মাধ্যমে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন হযরত মির্যা সাহেব যদি এখানে আসেন তবে সেটা হবে তার নিতান্ত সৌভাগ্য। প্রকৃতপক্ষে হযূর (রাঃ) যখন গৃহে আগমন করেন তখন জনাব শেঠ সাহেব এবং তার পরিবারের অন্যান্য লোকেরা খুবই সম্মান ও সম্বর্ধনার সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং গৃহের অন্য কোনে অবস্থিত একটি বড় সজ্জিত কক্ষে হুযূর (রাঃ) কে বসান এবং হুযূর (রাঃ) এর সামনে ফল পরিবেশন করেন এবং তার পরিবারের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর হুযূর (রাঃ) পবিত্র কক্ষে চলে গেলেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে নতজানু হয়ে বসে তসবীহ্ ও তাহমীদ করতে লাগলেন। এ কক্ষে সেই সময় জামাতের পক্ষ থেকে কার্পেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্থানের অপ্রতুলতার দরুন হযরত আমীরুল মু'মেনীন আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ছাড়া পঁয়ত্রিশ জন বন্ধু এ কক্ষে গমন করেন। এঁদের হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) সুশৃংখলভাবে একজন একজন করে ভিতরে পাঠান।

এঁরা হলেন ঃ–

(১) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ), (২) হযরত সাহেবযাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ সাহেব, (৩) সাহেবযাদা মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব, (৪) সাহেবযাদা মির্যা খলিল আহমদ সাহেব, (৫) সাহেবযাদা মির্যা হাফিজ আহমদ সাহেব, (৬) সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব, (৭) সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব, (৮) সাহেবযাদা মির্যা হামীদ আহমদ সাহেব, (৯) সাহেবযাদা মির্যা মোবাশ্বের আহমদ সাহেব, (১০) সাহেবযাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব, (১১) সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেব, (১২) হযরত খান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ), (১৩) সাহেবযাদা মাসুদ আহমদ খান সাহেব, (১৪) সাহেবযাদা আব্বাস আহমদ খান সাহেব, (১৫) হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব (রাঃ), (১৬) হযরত মৌলানা সৈয়দ সারুয়ার শাহ্ সাহেব (রাঃ), (১৭) হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ), (১৮) হযরত হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ), (১৯) হযরত হাফেজ মোখতার আহমদ সাহেব শাহজাহানপুরী, (২০) হযরত মৌলবী গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রাঃ), (২১) হযরত মৌলবী আব্দুর রহিম সাহেব দর্দ (রাঃ), (২২) জনাব শেখ বশীর আহমদ সাহেব, এ্যাডভোকেট, লাহোর, (২৩) হযরত ডাঃ হাসমত উল্লাহ্ সাহেব (রাঃ), (২৪) মৌলবী আব্দুল মান্নান সাহেব, এম, এ, (২৫) হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ), এম, এ, (২৬) হযরত মৌলবী আব্দুল মুঘনী খান সাহেব (রাঃ), (২৭) হযরত খান সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেব (রাঃ), (২৮) হযরত ডাঃ সৈয়্যদ গোলাম গাউস শাহ্ সাহেব (রাঃ) কাদিয়ান, (২৯) মিঞা ফিরোজ দীন সাহেব শিয়ালকোট, (৩০) হযরত হাফেজ নূর মুহাম্মদ সাহেব ফয়েজউল্লাহ্ চেক, (৩১) হযরত শেখ আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ), (৩২)হযরত মুন্সী মুহাম্মদ আল্ দীন সাহেব (রাঃ) খারিয়া, (৩৩) হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব জাট (৩৪) জনাব সুফী আবদুল কাদের সাহেব নিয়ায, বি, এ।

এ সকল বন্ধু ছাড়াও হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ)ও কক্ষে গমন করেন।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও দয়ায় দোয়াওয়ালা এ কক্ষ ও দালানের অর্ধেক অংশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের মালিকানায় রয়েছে। আজকাল এ কক্ষকে মসজিদরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন্ধুগণ বিপুল সংখ্যায় দোয়ার জন্য এখানে এসে থাকেন।

দারুল বয়াত লুধিয়ানা

সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী "মসীহ্ মাওউদ" সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ফাইয়াত-লুবুহু হাত্তা ইউদরিকাহু বিবাবি লুদ্দিন ফাইয়াকতুলাহু (মেশকাত, কেতাবুল ফিতন), সে দাজ্জালের পশ্চাদধাবন করবে এবং একে "বাবে লুধে"(এর শাব্দিক অর্থ হলো তর্কস্থল–অনুবাদক) দেখতে পাবে আর একে (যুক্তি-প্রমাণের ও দোয়ার সাহায্যে) হত্যা করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকদিক থেকে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও একটি বর্ণনা লিখিত রয়েছে।

পাঞ্জাব প্রদেশে খৃষ্টধর্মের সূচনা এভাবে হলো,আমেরিকা থেকে দু'জন খৃষ্টান মিশনারী ১৮৩৩ সালের ১৫ই অক্টোবর কোলকাতা পৌঁছল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর ইচ্ছানুযায়ী সেখানে এ সিদ্ধান্ত হলো ইংরেজ রাজত্বের সীমান্তে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূতরাং পাদ্রী জে, সি, লোরী ১৮৩৪ সালের ৫ই নভেম্বর লুধিয়ানা পৌঁছে গেল এবং সেখানে ইংরেজ শাসকবর্গ তাকে মিশন প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিল। তারা তাকে জমি দিল। আর এভাবে পাঞ্জাব প্রদেশে ১৮৩৭ সালে লুধিয়ানায় প্রথম খৃষ্টান গীর্জা নির্মিত হলো। আল্লাহ্‌তাআলার অদ্ভুত আচরণ দেখুন। তিনি এ লুধিয়ানা শহরেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে ১৩০৬ হিজরীর ২০শে রজব মোতাবেক ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ আহমদীয়া জামাতের ভিত্তি রেখে দাজ্জাল হত্যা অভিযানের সূচনা করে দেন। আর এ শহরের প্রথম শব্দও "লুধ"। যে জামাতের ভিত্তি লুধিয়ানায় রাখা হয়েছে সেই জামাতই সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে দাজ্জালের মূলোৎপাটন করছে।

গৃহের যে কক্ষে তিনি (আঃ) সর্বপ্রথম মৌলানা নূর উদ্দিন সাহেব (রাঃ) এর বয়াত নিলেন এবং জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন তাকে 'দারুল বয়াত' বলা হয়। এ গৃহটি ছিল হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের (রাঃ)। তিনি সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। কিন্তু জামাত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কন্যার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহুর বিয়েও হয়েছিল। সুফি সাহেব (রাঃ) এর পুত্রগণ এ গৃহটি সদর আঞ্জুমানের নামে দান পত্র করে দেন। সদর আঞ্জুমান এ গৃহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জামাতের ওপর সোপর্দ করে দেয়। ১৯১৬ সালে এর প্রথম আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন করে উত্তর দিকে একটি লম্বা ও পাকা এবং আলো-বাতাস খেলে এমন একটি কক্ষ তৈরী করে দেয়া হলো। এর উত্তর দিকের প্রাচীরের বর্হিদেশে 'দারুল বয়াত' নাম এবং ঐতিহাসিক বয়াতের ফলক লাগানো হয় এবং প্রাঙ্গণটি ইট দিয়ে আধা হাত উঁচু করা হয়। একটি মেহরাব বানিয়ে নামাযের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হলো। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে নামাযগাহে একটি ছোট ধরণের সুন্দর মসজিদ নির্মিত হলো। বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হলো। আঙ্গিনায় নলকুপ বসানো হলো। আর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গোসলখানা তৈরী করা হলো। একটি লম্বা কক্ষকে দু'টিতে পরিবর্তন করে পূর্বদিকের কক্ষে আহমদীয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এ কক্ষের পূর্বদিকের প্রাচীরের দক্ষিণ কোনের পাশে সেই পবিত্র জায়গা অবস্থিত যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বসে প্রথম বয়াত নিয়েছিলেন এবং জামাত স্থাপিত হয়েছিল। (তারীখে আহমদীয়াত, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১৬৯)

সমাপ্ত

কাদিয়ানের কতিপয় পবিত্র স্থানের ছবি

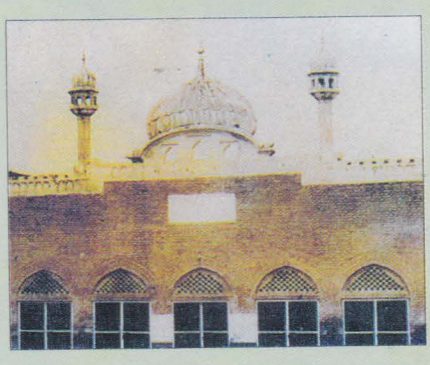

Qadian Aur Uske Mukaddas Mukamat
(Qadian and its Holy Places)

The author Muhtaram Muhammad Hameed Kawser has clearly narrated in this book the importance of Qadian and its various holy places keeping in view particularly those places which are more important from the point of view a special supplication to Allah. First of all he highlighted the importance of Qadian in the light of Hazrat Muhammad Mustafa's (Peace be on him) traditions and in the light of old scriptures and also in the light of Hazrat Masih Maud's[as] own writings. Then he vividly described the importance of the holy places like Masjid Mubarak, Hujra, Baitul Fikr, Baitud Doa, Baitur Riazat, Masjid Aqsa, Minaratul Masih, Beheshti Makbara, Masjid Noor etc. He has also discussed in his book about Hushiarpur and Ludhiana. Although these two places are outside Qadian they are highly esteemed by the Ahmadies all over the world, because Hazrat Masih Maud[as] made 'Chillakushi' at Hushiarpur and took first baiat at Ludhiana.

© Islam International Publications Ltd.

Qadian Aur Uske Mukaddas Mukamat
(Qadian and its Holy Places)
by
Muhammad Hameed Kawser
Additional Nazer Ishlah & Irshad
Talimul Quran & Wakfe Arzee, Qadian

Translated into Bangla by
Nazir Ahmad Bhuiyan

Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh